বঙ্গ কমলবার্তা

মে সংখ্যা। ২০২৫

অহিল্যাবাই হোলকর

সিঁদুর মোছার বদলা অপারেশন সিঁদুর

পঞ্জাবের আদমপুর বিমান ঘাঁটি পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ।

মুম্বইয়ে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল এবং এন্টারটেইনমেন্ট সামিট ২০২৫-এর ভারত প্যাভিলিয়নে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

পহেলগাঁওতে পাক সন্ত্রাসী হামলার পর ৭ লোক কল্যাণ মার্গে, নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

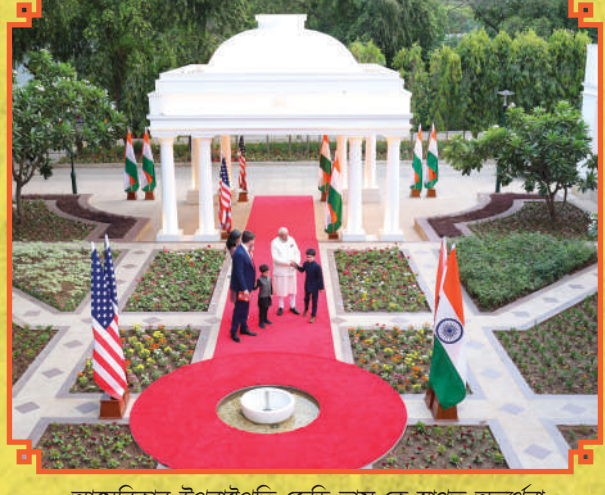

আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স-কে স্বাগত অভ্যর্থনা শ্রী নরেন্দ্র মোদীর। অতিথি দেব ভব।

যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে সৌদি আরব সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
মে সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

সিঁদুর মোছার বদলা অপারেশন সিঁদুর ৬
জয়ন্ত গুহ

জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না
প্রসঙ্গ সিন্ধু জলচুক্তি ৯
বিনয়ভূষণ দাশ

কাশ্মীরের হিন্দুত্ব, হিন্দুদের কাশ্মীর ১২
স্বাতী সেনাপতি

সে মন্দিরে দেব নেইঃ আছে ভক্তিবিহীন
ক্ষমতার দম্ভ ১৪
অভিরূপ ঘোষ

ছবিতে খবর ১৬

দেবী অহিল্যাবাই হোলকর: এক ভুলিয়ে
দেওয়া রাণীর কথা ২২
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের চোখে হিন্দুত্ব ২৫
সৌভিক দত্ত

ওয়াকফ সম্পত্তি আইন বাতিলঃ
বর্তমান সময়ের দাবী ২৮
রণদৃপ্ত শীল

দীপক ঘোষ-কে যেমন দেখেছি ৩০
পুলক নারায়ণ ধর

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

ভারত মানে হিন্দুরা মানে হিন্দুস্তান - কখনও আগে থেকে আক্রমণ করেনা। কিন্তু যখন করে তখন নির্বোধ, বিষাক্ত মোল্লারা ল্যাজ গুটিয়ে পালানোর পথ পায়না। ১৯৪৬ থেকে ২০২৫- একই কাণ্ড ঘটেছে। লিখিত প্রমাণ বলছে, প্রথমে ইসলাম আক্রমণ করে ভাষা-সংস্কৃতির ওপর। অখণ্ড বাংলা এবং বাংলা ভাষায় এর অজস্র উদাহরণ।

ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি বিরোধী পাকপন্থী এই বাঙালী ইসলামি মৌলবাদীদের বরাবরের জিহাদ হিন্দু বাঙালীর বিরুদ্ধে। সেই কোপে পড়েছেন খোদ রবীন্দ্রনাথও। এমনকি তারা মুর্শিদিগান, বেহুলার ভাসান, বেদে-বেদেনির গানকে-ও বর্জন করতে চেয়েছে ইসলামবিরোধী বলে। ত্যাগ করতে চেয়েছে পুঁথি সাহিত্য, কারণ তার মধ্যে সাচ্চা ইসলামি আদর্শ নেই। স্বাভাবিকভাবেই এই খুল্লমখুল্লা সাংস্কৃতিক আক্রমণ কাঠমোল্লারা করেনা। করে শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা বিষাক্ত পাকপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। অনেকে আবার একদা গান্ধিবাদী। প্রখর কংগ্রেসি বা বামপন্থী। সময় সুযোগ মত মুখোশ খুলে উগড়ে দেয় বিষ। 'বীর বা কবীর' এই তাত্বিক বুদ্ধিজীবিরা যথেষ্ট পরিমানে বিষ ছড়ানোর পর দ্বিতীয় দফায় মঞ্চে হাজির হয় ইসলামি জিহাদিরা। একমাত্র লক্ষ্য হিন্দু নিধন। বারেবারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি–১৯৪৬ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে হিন্দু গণহত্যা। ১৯৯০ কাশ্মীরি হিন্দু গণহত্যা। ২০২৫ ধর্ম জিজ্ঞাসা করে পহেলগাঁওয়ে হিন্দু গণহত্যা।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার আজ যে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের লঙ্কাদহন করেছে, এ অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। কিন্তু ১৯৪৬-২০২৫, 'কল্পনাতীত শাস্তি'-র জন্য ভারতীয় হিন্দুদের ৭৯ বছর অপেক্ষা করতে হল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নরেন্দ্র মোদীর এই 'কল্পনাতীত শাস্তি' নিছক বদলা নয়। বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসি-কম্যুনিস্টদের 'পাক-ইসলামি' চাটুকারিতার পাপস্খালন করছেন নরেন্দ্র মোদী।

পহেলগাঁওয়ে নির্বিচারে গণহত্যার পর যখন পাক ইসলামি জিহাদিরা বলেছিল- যা, মোদীকে গিয়ে বল..... সেদিন ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী হয়ত মহাশোকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। তিনি হয়ত যন্ত্রণায় নিথর হয়ে গিয়েছিলেন, যখন ওই বীভৎস গণহত্যার পর তাঁরই দেশের কিছু ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদ তাঁরই বিরুদ্ধে অনাস্থার আঙ্গুল তুলেছিল। কিন্তু তখনই তাঁর রাষ্ট্রনায়ক সত্তা নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিল- শুধু বদলা নিলে হবেনা। ৭৯ বছরের ছড়িয়ে পড়া বিষ তাঁকেই ধুয়েমুছে পরিষ্কার করতে হবে। মহাশোক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাপস্খালনের পথে, তাঁর শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে নিশ্চয়ই বেজে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই অবিচল মহামন্ত্র–

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে.....

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

পাকিস্তানের মদতে ভারতের মাটিতে জঙ্গি আক্রমণ, কান্দাহারে বিমান অপহরণের মত একাধিক আপৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়েছে এদেশ। সেই দুঃসময় থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখা, তথা হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার রাস্তা দেখিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী।

১৯৯৯-এ প্রায় দু মাস ধরে চলেছিল কার্গিল যুদ্ধ। দেশের প্রধানমন্ত্রী তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

১৯৯৯ সালের মে থেকে জুলাই মাস। সীমান্তের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। পাকিস্তানের মদতে, কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়তে শুরু করে পাক জঙ্গিরা। ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে থাকে পাকিস্তানি সেনাও।

সেদিনও চুপ করে থাকেনি ভারত। যাবতীয় আন্তর্জাতিক ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কড়া জবাব দেয় অটলবিহারীর ভারত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে জয় লাভ করে ভারতীয় সেনা।

প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে গর্ব করার মত জয়ের উদাহরণ রেখে যায় '৯৯ এর কার্গিল যুদ্ধ। যা অটলবিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়।

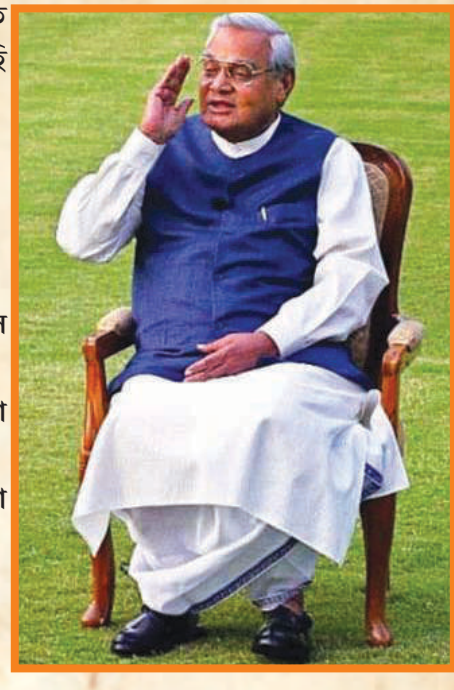

"এক নহি দো নহি করো বিশো সমঝোতে পর স্বতন্ত্র ভারত কা মস্তক নাহি ঝুকেগা
অগণিত বলিদানো সে অর্জিত ইয়ে স্বতন্ত্রতা
অশ্রু, শোক, শৌর্য সে সিঞ্চিত ইয়ে স্বতন্ত্রতা
ত্যাগ তেজ তপবল সে রক্ষিত ইয়ে স্বতন্ত্রতা
দুখি মনুজতা কি হিত অর্পিত ইয়ে স্বতন্ত্রতা
ইসে মিটানে কি সাজিস করনেওয়ালো সে কহে দো চিঙ্গারি কা খেল বুড়া হোতা হ্যায়
অরো কে ঘর আগ লাগানে কা জো সপনা আপনে হি ঘর মে সদা খাড়া হোতা হ্যায়
আপনে হি হাতো তুম আপনি কবর না খোদো
আপনে পায়রো আপ কুলহাদি নাহি চালাও
ও নাদান পড়োসি আপনি আঁখে খোলো
আজাদি আনমোল না ইসকা মোল লাগাও

পর তুম ক্যয়া জানো আজাদি ক্যয়া হোতি হ্যায় তুমহে মুফত মে মিলি না কিমত গই চুকাই
আংরেজো কে বল পর দো টুকড়ে পায়ে হ্যায় মা কো খন্ডিত করতে তুমকো লাজ না আয়ি
আমেরিকি শস্ত্র সে আপনি আজাদি কো দুনিয়া মে কায়েম রাখ লোগে ইয়ে মত সমঝো
দশ বিশ আরব লেকর আনে ওয়ালি বরবাদি সে তুম বাচ লোগে ইয়ে মত সমঝো
ধমকি জিহাদ কে নারো সে হাতিয়ারো সে কাশ্মীর কাভি হাতিয়ালোগে ইয়ে মত সমঝো
হামলো সে অত্যাচারো সে সংহারোসে সে ভারত কা শিশ ঝুকা লোগে ইয়ে মত সমঝো
যবতক গঙ্গা কি ধর সিন্ধু মে জোয়ার অগ্নি মে জ্বলন সূর্য মে তপন শেষ
স্বতন্ত্র সমর কি বেদি পর অর্পিত হোঙ্গে অগণিত জীবন যৌবন অশেষ
আমেরিকা কেয়া সংসার ভালে হি হো ব্যার্থ কাশ্মীর পর ভারত কা শর নাহি ঝুকেগা
এক নহি দো নহি করো বিশো সমঝোতে স্বতন্ত্র ভারত কা নিশ্চয় না রুকেগা।"

-ভারতে শান্তি বিঘ্নকারী পাকিস্তানকে নিয়ে লেখা কবিতা
অটল বিহারী বাজপায়ী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারত।

সিঁদুর মোছার বদলা
অপারেশন সিঁদুর

জয়ন্ত গুহ

“সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা সন্ত্রাসবাদীদের হেডকোয়ার্টার মুছে দিয়েছি। অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি নাম নয়। কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাবনার প্রতিবিম্ব- অপারেশন সিঁদুর,” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হ্যাঁ, বদলা। বদলাই বলব। কোনও দ্বিধা নেই বলতে। পহেলগাঁওয়ে পাক সন্ত্রাসীদের বীভৎস হত্যালীলার বদলা। নিরীহ পর্যটকদের ওপর পাক জঙ্গিদের হত্যালীলার বদলা। কাপুরুষের মত হত্যার বদলা। কলমা পড়তে জানে কিনা, জিজ্ঞাসা করার বদলা। ধর্ম জিজ্ঞাসা করে মাথায় গুলি করে খুন করার বদলা। হিন্দু বলে ২৬ জনকে গুলি করে খুন বদলা। ভারতের মাটিতে পাক জঙ্গি আক্রমণের বদলা। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জঙ্গি ষড়যন্ত্রের বদলা। পহেলগাঁওয়ে অসহায় মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দেওয়ার বদলা- ভারতের অপারেশন সিঁদুর।

সরাসরি পাকিস্তান যোগ

২২ এপ্রিল, এক এক করে ২৬ জনকে ধর্ম জেনে, হিন্দু কিনা নিশ্চিত হয়ে তারপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মাথায় গুলি করে যারা পালিয়েছিল সেই ইসলামিক জঙ্গিরা কারা? আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়েছিল নাকি আচমকা গজিয়ে উঠেছিল মাটির তলা থেকে? পাকিস্তানের কোনও যোগ ছিলনা? পাকিস্তানের কুখ্যাত আইএসআই-এর যোগ ছিলনা? পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ ছিলনা। ছিল শুধু নয়। জোরালোভাবে ছিল। পাকিস্তানি সেনার কাছে প্রশিক্ষণ নিত জঙ্গিরা। পাকিস্তান সেনার বিশেষ বাহিনী, স্পেশাল সিকিউরিটি গ্রুপ-এর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল জঙ্গিরা। সেখানে বসেই নীল নকশা তৈরি হয় পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের। জঙ্গি হামলায় জড়িতদের মধ্যে অন্যতম হাসিম মুসা সরাসরি পাক সেনার সদস্য, পাকিস্তান স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের প্যারা কমান্ডো ছিল। পরে সে লস্কর-ই-তইবার সদস্য হয়। অন্যতম মাস্টারমাইন্ড আদিল গুরি ২০১৮ সালে অটারী-ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল প্রশিক্ষণ নিতে। পহেলগাঁওয়ে পাক সন্ত্রাসীদের হিন্দু হত্যার মূল মাথা, ৫০ বছর বয়সি শেখ সাজ্জাদ গুল। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা। নাম ভাড়িয়ে সাজ্জাদ আহমেদ শেখ, লস্কর-ই তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) সংগঠনের শীর্ষ পদে আসীন। যুক্ত ছিল ২০২৩ সালে মধ্য কাশ্মীরে গ্রেনেড হামলা কিংবা অনন্তনাগে পুলিশকর্মী হত্যায়। বৈসরনের হত্যালীলায় অন্তত পক্ষে পাঁচ থেকে সাতজন জঙ্গির যোগ ছিল এবং পাকিস্তান অস্বীকার করলেও এই

হত্যাকাণ্ডের পিছনে সরাসরি ছিল পাকিস্তানের হাত।

একবার-দুবার নয়, বারেবারে ভারতকে জঙ্গি হানায় রক্তাক্ত করেছে পাকিস্তান। সংসদে জঙ্গি হামলা, ২৬/১১-য় মুম্বই হামলা, পাঠানকোট-উরি-পুলওয়ামা হামলা। কিন্তু পহেলগাঁও হত্যালীলার পর প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, এবার তিনি শ্বাসরোধ করে ছাড়বেন পাকিস্তানের। গোটা দেশ তখন রাগে ফুঁসছে। দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী গোটা পৃথিবী তখন বদলা চাইছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। মধুবনী থেকে হুঙ্কার দেন নরেন্দ্র মোদী। "১৪০ কোটি ভারতীয়ের ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসবাদীদের কোমর ভাঙবে। যে সন্ত্রাসবাদীরা এই হামলা ঘটিয়েছে এবং যারা এই হামলার ষড়যন্ত্র করেছে, তারা এমন শাস্তি পাবে, যা তাদের কল্পনারও অতীত"। পাকিস্তান তখনও বোঝেনি মোদী যা বলেন তাই করেন। এরপর স্থগিত করে দেওয়া হয় সিন্ধু চুক্তি। মনে হয়েছিল ভারতের এই 'ভূ-কৌশলী অস্ত্রে' নত হবে পাকিস্তান। কোথায় কি? উল্টে সালোয়ার পরা জঙ্গি পাকিস্তান হুঙ্কার দেয় 'সিন্ধুর জল বন্ধ হলে রক্তগঙ্গা বইবে'। কিন্তু তখনও কল্পনা করতে পারেনি ভারতের 'কল্পনাতীত আঘাত' এগিয়ে আসছে তাদের আদর করে পোষা জঙ্গিদের ডেরায়।

অপারেশন সিঁদুর

পহেলগাঁওয়ে বীভৎস সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দলমত নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এক জোট হয়ে যায়। রনহুঙ্কার দিতে থাকে। এক স্বরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী তোলে গোটা দেশ। তখন ভারতমাতার সম্মানে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি মাটিতে মিশিয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদী দেশের সেনাবাহিনীর হাতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তুলে দেন। শুরু হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাড়হিম করা অপারেশন সিঁদুর।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, "আজ প্রতিটি সন্ত্রাসী এবং

সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জানে, আমাদের মা-বোনেদের সিঁথি থেকে সিঁদুর মুছে দেওয়ার পরিণতি কি হতে পারে। অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি নাম নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষের ভাবনার প্রতিবিম্ব, ন্যায়ের অখন্ড প্রতিজ্ঞা"।

৬মে গভীর রাত থেকে ৭মে সকাল- ভারত সহ গোটা পৃথিবী দেখেছে এই প্রতিজ্ঞার পরিণাম কি হতে পারে! মাত্র ২৫ মিনিটের অপারেশন। ভারতীয় বায়ুসেনার ভয়ানক আক্রমণে গুড়িয়ে যায় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিদের ৯টি ঘাঁটি। ধুলোয় মিশে যায় জইশ-ই-মহাম্মদের প্রধান প্রশিক্ষণ ও মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র **বাহওয়ালপুরের মারকাজ সুবহান আল্লাহ** এবং লস্কর-ই-তইবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র **মুরিদকের মারকাজ তইবা**। এছাড়া অন্য যে ঘাঁটিগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া হয় তার মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আড়ালে চলা আইএসআই-এর সহযোগিতায় তৈরি **সারজাল তাহরা কালান**। এই ঘাঁটি থেকে চলত জঙ্গিদের ভারতে পাঠানোর চক্র। হিজবুল

মুজাহিদিনের ঘাঁটি **সিয়ালকোটে মাহমুনা জোয়া**। জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় এই ঘাঁটি। ১৯৯৫ সালে জম্মুতে বিস্ফোরণের নেপথ্যেও ছিল পাকিস্তানের এই ঘাঁটি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে লস্কর-ই-তইবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি **মারকাজ আহলে হাদিস, বারনালা, ভিম্বার**। মূলত 'স্টেজিং সেন্টার' হিসাবে এই ঘাঁটি ব্যবহার করত লস্কর জঙ্গিরা। পাক সেনার ঘাঁটি থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে জইশ-ই-মহাম্মদের ঘাঁটি **মারকাজ আব্বাস, কোটলি**। ভারতের পুঞ্চ এবং রাজোরি সেক্টরে অনুপ্রবেশ করা জঙ্গিরা মূলত এই লঞ্চপ্যাড থেকেই ভারতে ঢুকত। এই মারকাজের নেতাদের নাম রয়েছে এনআইএর মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। হিজবুল মুজাহিদিনের ঘাঁটি পাহাড়ের কোলে **মাসকার রাহিল শহিদ, কোটলি**। অস্ত্র শিক্ষা, পাহাড়ে চড়া, সীমান্ত পেরিয়ে বেঁচে থাকার বিশেষ কৌশল শেখানো হত এখানে। প্রতিকূল পরিবেশেও আলাদা করে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল এই ঘাঁটিতে। লস্কর-ই-তইবার প্রধান ঘাঁটিগুলির মধ্যে অন্যতম **শাওয়াই নাল্লা ক্যাম্প, মুজঃফরাবাদ**। এই ঘাঁটিতে নবাগতদের স্বাগত জানাতে হাজির থাকত হাফিজ সৈয়দ স্বয়ং। পাক সেনার প্রশিক্ষকরাও এই ঘাঁটিতে তালিম দিত জঙ্গিদের। জিপিএস ব্যবহার, মানচিত্র দেখে দিক নির্ণয় এবং বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণও দেওয়া হত এই ঘাঁটিতে। **মুজঃফরাবাদের মারকাজ সাইয়্যেদনা বিলাল**। বিষাক্ত জইশ-ই-মহাম্মদের জঙ্গিরা ভারতে অনুপ্রবেশের আগে এই ঘাঁটিতে এসে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিত। পাকিস্তানের বিশেষ এসএসজি বাহিনীর তরফে এই ঘাঁটির জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া জঙ্গিনেতাদের অনেকেই এই ঘাঁটির সঙ্গে জড়িত।

সন্ত্রাসী পাকসেনার হামলা, ভারতের প্রত্যাঘাত

অপারেশন সিঁদুরের পরাক্রমে মারা যায় ১০০-র বেশী কুখ্যাত জঙ্গি, পৃথিবীর যে কোনও ইসলামি জঙ্গি হামলায় যাদের

ভারতীয় বিমান হানায় তছনছ পাকিস্তানি সেনার একের পর এক বিমানঘাঁটি।

জোরালো যোগ ছিল। পাকিস্তানের বরাবর দাবী তারা নাকি তাদের দেশে জঙ্গি পোষেনা। তাদের সেনার সঙ্গে নাকি জঙ্গি যোগ নেই। তাদের নেতারা নাকি সেনা-জঙ্গির আঁতাত নিয়ে কিছুই জানেনা। তাহলে অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ওড়ালে তাদের কি? তাদের তো উচিত ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে তাদের দেশের জঙ্গি নিকেশ করা! ভারতের লড়াই ছিল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু লজ্জাজনক ভাবে পাকিস্তানের সেনা সন্ত্রাসবাদীদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পাক সেনা আক্রমণ করে ভারত। আক্রমণের নিশানা করে ভারতীয় মন্দির, গুরুদুয়ারা, ইশকুল, কলেজ, সাধারণ নাগরিকদের ঘরবাড়ি এবং ভারতীয় সেনাঘাটি। পাকিস্তানের আক্রমণ ধ্বংস করে দেওয়া হয় আকাশপথেই। প্রত্যাঘাতে ভারতীয় বায়ুসেনা তছনছ করে দেয় পাকিস্তানের ৮ বিমানঘাঁটি।

ভারতের কাছে নতজানু পাকিস্তান

১০ মে ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ বিবৃতি দিয়ে জানায়, "পাকিস্তানের রফিকি, মুরিদকে, চাকলালা এবং রহিম ইয়ার খান বায়ুসেনা ঘাঁটিতে আকাশপথে হামলা চালানো হয়েছে। এ ছাড়া নিশানা করা হয় সুক্কুর এবং চুনিয়ায় পাক সেনাঘাঁটি, পসরুর এবং সিয়ালকোটের বিমানঘাঁটি।''

শুধু লাহোর বা রাওয়ালপিন্ডিই নয়, করাচির মালির ক্যান্টনমেন্টে থাকা এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় বায়ুসেনা। ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তানের মিরাজ বিমানও। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে এয়ার মার্শাল একে ভারতী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সারগোদা বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে কিরানা পাহাড়ে ভারত কোনও হামলা চালায়নি। কিরানা পাহাড়ের ভিতরে বাঙ্কারেই রয়েছে পাকিস্তানের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের ভান্ডার। সব মিলিয়ে চার দিনের সংঘর্ষে পাকিস্তানের ১১টি বায়ুসেনা ঘাঁটি ভারতের আক্রমণে লণ্ডভণ্ড। রাওয়ালপিন্ডির চাকলালায় নুর খান এয়ারবেস এবং (সারগোদা) মুশাফ এয়ারবেসে ভারতীয় সেনার হামলার পর পরিষ্কার হয়ে যায় যে ভারত চাইলে ইসলামাবাদকে লক্ষ্য করে আক্রমণ শানাতে পারে বা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে সারগোদা বিমানঘাঁটির কাছে পাকিস্তানের 'সামরিক অ্যাসেট'। আক্ষরিক অর্থেই এরপর নতজানু হয় পাকিস্তান। নানাভাবে সংঘর্ষবিরতির জন্য কুইকুই শুরু করে। দুই পক্ষের আলোচনায় সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা হয় কিন্তু জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার জানিয়ে দেন সিন্ধুচুক্তির স্থগিতাদেশ এখুনি তুলে নেওয়া হবেনা। জারি থাকবে অপারেশন সিঁদুর। আলোচনায় বসতে হলে পাকিস্তানকে ফেরাতে হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। নয়া ভারতের সংজ্ঞা এখন ৩টি সূত্রে গাথা- "এক: সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। নিজের শর্তে জবাব দেবে। দুই: ভারত কোনও নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল (পরমাণু হুমকি) সহ্য করবে না। তিন: সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের আলাদা করে দেখবে না ভারত।" পাকিস্তান কি পারবে এই বিষম চাপ নিতে নাকি চাপেই ভেঙ্গে যাবে ৪ টুকরো হয়ে?

জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না
প্রসঙ্গ সিন্ধু জলচুক্তি

বিনয়ভূষণ দাশ

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা ভারতের পক্ষে একটা জোরালো কূটনৈতিক 'সারজিক্যাল স্ট্রাইক'। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দাবার চাল বদলে গেছে। মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্রস্থল আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন ভারতের সোজাসাপটা বার্তা, রক্ত ও জলপ্রবাহ একসঙ্গে চলবে না, ভারতে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানী করলে পাকিস্তান মরুভূমিতে পরিণত হবে।

সাম্প্রতিককালে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পহেলগাঁও- এ হিন্দু হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের মিলিটারি শাসক ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আয়ুব খাঁ স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি সম্পর্কে ভারতের বর্তমান প্রজন্ম বিশেষভাবে পরিচিত নয়। চুক্তিটি বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয়। যদিও পহেলগাঁওয়ে সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানি মুসলিম জঙ্গি দ্বারা ২৬ জন নিরপরাধ হিন্দু পর্যটক হত্যার প্রেক্ষিতে ভারত দ্বারা এই চুক্তিটি স্থগিত করার ঘটনায় সকলেই এই চুক্তিটির নাম অবগত হয়েছেন। পাকিস্তানের এই হিংস্র, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কেবলমাত্র কূটনৈতিক প্রতিবাদ এবং শূন্যগর্ভ সতর্কবার্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। ফলে এই চুক্তি স্থগিত রেখে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হল, যে কোন ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে; এক্ষেত্রেও সেটা হবে।

স্থগিত সিন্ধু জল চুক্তি, বেকায়দায় পাকিস্তান।

আর যারা এক্ষেত্রে মানবতার কথা বলছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে পাকিস্তান দশকের পর দশক ভারতকে দুর্বল করার প্রয়াসে নিমগ্ন থেকেছে। যে প্রতিবেশী তার সমস্ত সম্পদ লগ্নি করেছে কেবলমাত্র সামরিক খাতে, তাকে খয়রাতি দেবার কোন দায় ভারতের নেই। এটা সত্য যে, শীঘ্রই খুব বড় পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সমস্ত বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এরই মধ্যে পাকিস্তানের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। পর্যাপ্ত জলের অভাবে পাকিস্তানে বন্ধ হয়ে যেতে পারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন; বিশাল অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। আর মনে রাখতে হবে, ভারত এই কাজ করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে। বলা হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ জমি অথবা তত্ত্বের ভিত্তিতে

পাকিস্তানের জামশোরোতে ইতিমধ্যেই শুকিয়ে গেছে সিন্ধু নদী।

জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় চন্দ্রভাগা নদীর উপর সালাল বাঁধ।

হবে না, যুদ্ধ হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ; জল নিয়ে। এক্ষেত্রে এই প্রবচনই সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে।

তাই এই চুক্তিটি কি এবং কেন এ সম্পর্কে আলোচনা বিশেষ জরুরি

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আয়ুব খাঁর মধ্যে করাচিতে স্বাক্ষরিত হয় ভারতের স্বার্থহানিকর এই 'সিন্ধু জল চুক্তি, ১৯৬০'। এই চুক্তির মোদ্দাকথা হল, সিন্ধু নদী ও তার অববাহিকাস্থিত নদীগুলির একটি সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদন করা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতে করে ওই নদীগুলির জল দুই দেশ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের বাতাবরণে; সহমর্মিতার ভিত্তিতে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সিন্ধু নদের অববাহিকার ছয়টি নদীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল; পূর্বদিকের তিনটি নদী—বিপাশা , ইরাবতী এবং শতদ্রু নদীত্রয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে থাকবে আর পশ্চিমদিকের নদীত্রয় – সিন্ধু, ঝিলাম (বিতস্তা) এবং চন্দ্রভাগা নদীর জলধারার উপর কর্তৃত্ব থাকবে পাকিস্তানের হাতে। যদিও, পশ্চিমদিকের নদীগুলির জলের উপর সীমিত কর্তৃত্ব ভারতের হাতেও অর্পিত হয়েছিল। ভারত এই নদীগুলির জল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। একটি স্থায়ী কমিশনও গঠন করা হয়েছিল এই চুক্তি তত্ত্বাবধানের জন্য । ভারত অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়ে সিন্ধু অববাহিকার ৮০% জল পাকিস্তানকে ব্যবহারের জন্য দিতে রাজি হয়েছিল যেমন নেহরু অন্যান্য ক্ষেত্রেও করেছিল। গত ৬৫ বৎসর ধরে ভারত তাঁর এই উদারতা দেখিয়ে এসেছে পাকিস্তানের সব রকমের বিশ্বাসহীনতা সত্ত্বেও। কিন্তু নদীর জলপ্রবাহের মতই ধৈর্যেরও সীমা আছে। এইবার সেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। পাকিস্তান তার রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করেছে; অন্যদিকে তারা ভেবেছে, ভারত পাকিস্তানের স্বার্থে জল চুক্তিসহ সব চুক্তিকেই সম্মান করে যাবে চিরকাল। কিন্তু, নতুন ভারতের নীতি খুবই সরল --- শান্তি ব্যতিরেকে চুক্তি অনুযায়ী জল আর প্রবাহিত হবে না। আরও স্মর্তব্য যে, ভারতের সব বন্ধু দেশই এক্ষেত্রে ভারতকে সমর্থন করেছে। এমনকি ভিয়েনা কনভেনশনে গৃহীত 'Law of Treaties' অনুযায়ী অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হলে ভারত যে কোন চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে; আর ভারত সেটাই করেছে। স্বাক্ষরিত এই দলিলটি প্রায় আশি পৃষ্ঠার। সিন্ধু নদীর অববাহিকাস্থিত নদীগুলি

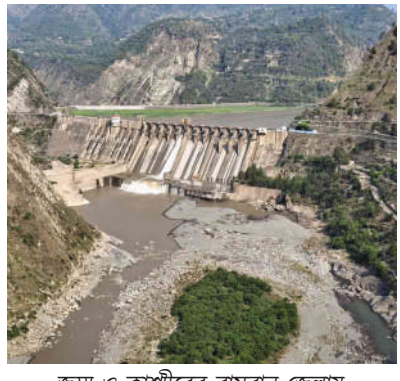

জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় চন্দ্রভাগা নদীর উপর বাগলিহার বাঁধ।

ঝিলাম, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা , ইরাবতী, বিপাশা এবং সন্নিহিত সংযোগকারী বিভিন্ন হ্রদ। চুক্তি অনুযায়ী এই নদীগুলির জল কৃষিকাজ, গার্হস্থ প্রয়োজন ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। গার্হস্থ প্রয়োজনের মধ্যে পানীয় জল,স্নান, ধৌতকরণ ইত্যাদি। কিন্তু জল বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি এই ব্যবহারের মধ্যে নেই।

যাইহোক, চুক্তির বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না গিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করা জরুরি। এই চুক্তিটি ক্রিয়াশীল হয়েছে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে। যদিও চুক্তিটি প্রাথমিকভাবে দশ বৎসরের জন্য করা হয়েছিল; কিন্তু বার তিনেক, ১৯৬৫, ১৯৭১ এবং ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে বারে বারে এবং ভারত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। অথচ, এই চুক্তিটির ফলে পাকিস্তান সিন্ধু নদী ও তার অববাহিকার ৮০ শতাংশ জল সেই দেশের কৃষিকাজ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের জন্য ব্যবহার করছিল। আর ভারত পাচ্ছিল বাকি মাত্র ২০ শতাংশ। পাকিস্তানের কৃষিব্যবস্থা ও তার অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে এই সিন্ধু জল চুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পাকিস্তান ক্রমাগত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। আর যে দেশ তার পড়শি দেশে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়মিত পাঠায় তাঁরা আর যাই হোক কোন সহমর্মিতা আশা করতে পারে না। তাঁরা পড়শি দেশে সাধারণ নাগরিকদের রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে জলের ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহমান থাকার আশা করতে পারে না। জল কেবলমাত্র একটি

সম্পদ নয়, এটি জীবনধারণের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। রক্তের বিনিময়ে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বইতে পারে না। পাকিস্তানের কৃষিকাজ, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সমস্তকিছুই নির্ভর করছে এই সিন্ধু জল চুক্তির উপর।

পহেলগাঁও-এর বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তানের জঙ্গিদের দ্বারা নিরপরাধ পর্যটকদের হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ এপ্রিল পহেলগাঁও এর ঘটনার মোদীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট কমিটি অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে উল্লিখিত সিন্ধু জল চুক্তি, ১৯৬০ স্থগিত করে দেয়। মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে দুই দেশের মধ্যে জল ভাগাভাগি নিয়ে যে সহযোগিতার চুক্তি ছিল সেটি স্থগিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, এই নিয়ে পঞ্চম বার শ্রী মোদী সিন্ধু জল চুক্তিকে ব্যবহার করেছেন পাকিস্তানকে সবক শেখাতে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, গত বৎসর ৩০ আগস্ট মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার এই সিন্ধু জল চুক্তি কিছু অদলবদলের জন্য নোটিস পাঠিয়েছিল চুক্তিটির অনুচ্ছেদ XII (3) অনুযায়ী। এছাড়া ২০২৩ সালের ২৫ জানুয়ারিও নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই চুক্তিটির আংশিক পরিবর্তনের জন্য নোটিস দিয়েছিল। বাস্তবিক, শ্রীমোদী পাকিস্তানের উরি-তে আক্রমণের অব্যবহিত পরেই এই জল চুক্তিকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। সেই সময়ে তাঁর একটি বিবৃতি স্মরণীয়—রক্ত ও জল একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে না। ভারতের এই সিদ্ধান্ত আসলে বহুবছর থেকে চলে আসা চূড়ান্ত ভ্রান্ত সংযম থেকে সরে আসার দৃষ্টান্ত। বাস্তবে এটি হল কূটনৈতিক সারজিক্যাল স্ট্রাইক। এটা ভারতের দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ --- সাহসী, সুচিন্তিত, গুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী। পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কৃষিকর্ম প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই সিন্ধু, ঝিলাম এবং চন্দ্রভাগা নদীর জলের উপর। এই জল দিয়েই জমি জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পানীয় জলের জলাধারগুলি পূর্ণ করা হয়। ভারত সিন্ধু অববাহিকার জলের প্রবাহ আটকে দিলে বা সীমাবদ্ধ করে দিলে পাকিস্তান অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে; তার ভঙ্গুর অর্থনীতি বিশাল সঙ্কটে পড়বে। অর্থাৎ, মোটের উপর বলতে গেলে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার ফলে পাকিস্তান অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত পথেই। পাকিস্তান এই জল চুক্তি স্থগিত করাকে ' যুদ্ধের শামিল' বলে উল্লেখ করেছে। এমনকি পারমানবিক যুদ্ধের কথাও উল্লেখ করেছে। কিন্তু শূন্যগর্ভ ভয় দেখিয়ে ক্যানাল তৈরি করা যায় না, জমিতে সেচ দেওয়া যায় না; অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না। পাকিস্তানকে একথা মনে রাখতে হবে।

ভারত কর্তৃক সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার

রক্তের বিনিময়ে জল প্রবাহিত হতে পারেনা।

প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান ১৯৭২-এ স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করেছে। এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের হাতে পাকিস্তানের লজ্জাজনক হারের পরে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোন বিবাদ মীমাংসার কথা বলা হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে; কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। ফলে এই চুক্তি বাতিলের ফলে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শেষ সাঁকোটাও ভেঙ্গে দিয়েছে। পাকিস্তান সিমলা চুক্তি বাতিল করে কাশ্মীর ইস্যুকে আবার আন্তর্জাতিকস্তরে নিয়ে যেতে চাইছে যেটা সে করবে না বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীর কোন দেশই আর পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়; সন্ত্রাসবাদকে ধারাবাহিকভাবে মদত দেওয়ায় দেশটি এখন ঘৃণিত সর্বত্র। আর ভারত এখন অনেক বেশী ভু-রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন। দীর্ঘকাল ধরে ভারত পাকিস্তানের 'প্রক্সি' যুদ্ধ সামলেছে ধৈর্য ও আত্মসংবরণ করে। এখন সে সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ জলকে ব্যবহার করছে নতুন অস্ত্র হিসেবে। এই নতুন ভারত প্রমাণ করে দিচ্ছে, সে এখন অর্থনৈতিক ও আইনসম্মত ভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে, পাকিস্তানকে বাধ্য করতে পারে, কিছু করা নয়, কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়া দিতে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ভারত দেখিয়ে দিয়েছে, মূল শক্তি বোমা বা যুদ্ধে নয়, মূল শক্তি নিহিত আছে ধীর, অবিরাম গতিতে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহের মধ্যে; অথবা হঠাৎ করে তার গতি রুদ্ধ হওয়াতে। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা ভারতের পক্ষে একটা জোরালো কূটনৈতিক 'সারজিক্যাল স্ট্রাইক'। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দাবার চাল বদলে গেছে। মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্রস্থল আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যখন মানুষের বিশ্বাস হত্যা করা হয় সন্ত্রাসবাদের দ্বারা, যখন নদী তার গতি পরিবর্তন করে; তখন ভবিতব্যও বদলে যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে হুঙ্কার দিয়েছিলেন,' আমরা অগো ভাতে মারুম, পানিতে মারুম'। আজকে আবার পাকিস্তানের সেই একই দশা হয়েছে ! নবোত্থিত ভারতও পাকিস্তানকে হুশিয়ারী দিয়েছে, রক্ত ও জলপ্রবাহ একসঙ্গে চলবে না, ভারতে সন্ত্রাসবাদ রপ্তানী করলে জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে; ধূসর মরুভূমিতে পরিণত করে পাকিস্তানকে, 'জলে' মারা হবে পাকিস্তানকে। আর বাংলাদেশের জন্য আছে তিস্তা নদীর জল।

কাশ্মীরের হিন্দুত্ব, হিন্দুদের কাশ্মীর

স্বাতী সেনাপতি

এটাই কি সেই কাশ্মীর যেখান থেকে রাতারাতি এক বস্ত্রে সব হারিয়ে পালিয়ে আসতে হয় হিন্দু কাশ্মীরি পন্ডিতদের? কাশ্মীর মানে শুধুই কি রক্তের ছিটা, বোমা, বারুদ, গুলি, সন্ত্রাস, ভারত বিদ্বেষ? নাকি কাশ্মীরের শিকড় প্রোথিত আছে ভারতবর্ষের অনেক গভীরে? যে শিকড়ের প্রাণ হল হিন্দুত্ব?

"জয়তু জয়িনীং স্ফুটঘোষস্ফুটিতদিবিষদ্বিভাসিনীং লীলয়া।
কলয়তি কোটিকমলাম্বুজপঙ্কজাঞ্জলিং কাশ্মীরদেশধুরীণঃ॥ "- রাজতরঙ্গিণী, কলহন।

(জয় হোক সেই বিজয়িনী দেবীর, যাঁর জয়ধ্বনি স্পষ্টভাবে দেবলোক পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়,
যিনি লীলাভঙ্গিতে কোটি কোটি পদ্মফুলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন।
তিনিই কাশ্মীর দেশের শ্রেষ্ঠ অলংকার, গৌরব।)

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বুকে আবারও পাকিস্তানের মদতে ২৬ জন তরতাজা হিন্দুর প্রাণ কেড়ে নিয়ে ইসলামিক জঙ্গিরা প্রমাণ করে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদেরও ধর্ম হয়। সাম্প্রতিক অতীতে স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৭০ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে ভূস্বর্গ। চক্রান্ত হয়েছে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গকে আলাদা করে দেওয়ার। স্লোগান উঠেছে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে। আফজল গুরুর মত সন্ত্রাসবাদীকে দেওয়া হয়েছে শহীদের মর্যাদা। কিন্তু এটাই কি আসল কাশ্মীর? যেখানে ঘরে ঘরে বাচ্চাদের ছোট থেকে পাথর ছুঁড়তে শেখানো হয়, শেখানো হয় ভারত বিদ্বেষ? এটাই কি সেই কাশ্মীর যেখান থেকে রাতারাতি এক বস্ত্রে সব হারিয়ে পালিয়ে আসতে হয় হিন্দু কাশ্মীরি পন্ডিতদের? কাশ্মীর মানে শুধুই কি রক্তের ছিটা, বোমা, বারুদ, গুলি, সন্ত্রাস, ভারত বিদ্বেষ? নাকি কাশ্মীরের শিকড় প্রোথিত আছে ভারতবর্ষের অনেক গভীরে? যে শিকড়ের প্রাণ হল হিন্দুত্ব?

ভারতবর্ষের হিন্দুত্বের প্রাচীন ইতিহাসের মতোই কাশ্মীরের হিন্দুত্বের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। নিলামাত পুরাণে প্রাচীন কাশ্মীরের বর্ণনা পাওয়া যায়।কাহিনী অনুসারে, কাশ্মীরে একসময় 'সতীসার' নামে একটি হ্রদ ছিল, যা ঋষি কাশ্যপ শুকিয়ে এই উপত্যকাকে বাসযোগ্য করে তোলেন। 'কাশ্মীর' নামটিও কাশ্যপের নাম থেকেই উৎপন্ন। মূলত নাগ এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল এই কাশ্মীর। দ্বাদশ শতকে লেখা কবি কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'-ও বলছে হ্রদ থেকেই কাশ্মীরের উৎপত্তি।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল হিন্দু দর্শন, সাহিত্য এবং বিদ্যার এক প্রধান কেন্দ্র। এই সময়ে অনেক প্রখ্যাত দার্শনিক, কবি ও পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন কাশ্মীরে। পুরাকালের কাশ্মীর যদি বাদ ও দেওয়া হয়, তাহলেও দেখা যায় যুগ যুগ ধরে জ্ঞান চর্চার পীঠস্থান ছিল কাশ্মীর। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর লেখায় জানা যায় কোনও বিদগ্ধ পন্ডিতকে, সার্বিকভাবে জ্ঞানী বলে মনে করা হত না যতক্ষণ না তিনি কাশ্মীরি পন্ডিতদের সঙ্গে তর্কসভা বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। হিউয়েন সাঙ-এর লেখনীতে "কাশ্মীরের মানুষজন সংস্কৃতিজ্ঞ তো ছিলেনই। পাশাপাশি জ্ঞানীও ছিলেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জ্ঞান, শিক্ষার চর্চা করেছে কাশ্মীরিরা।"

ইরানের পন্ডিত আল বেরুনীর লেখাতেও কাশ্মীরের জ্ঞান চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখনী থেকে জানা যায়, "কাশ্মীর ছিল হিন্দু পন্ডিতদের জ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। বহু দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসতেন শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম হতে। কাশ্মীরের অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখে তাঁদের অনেকেই পরবর্তীতে এখানে থেকে যান।"

উনিশ শতকের পাহাড়ি চিত্রকলায় অমরনাথ গুহা মন্দির।

প্রাচীন কাশ্মীরের ধর্ম হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় মূলত শৈব ধর্মের। শৈব ধর্মের একাধিক নিদর্শন, মন্দির এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাশ্মীরের ইতিউতি। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে কাশ্মীরের শৈববাদ ভারতের হিন্দু ধর্মের শাখায় এক অন্যতম অবদান। এটি এক অদ্বৈতবাদী তত্ত্ব, যেখানে পরম শিবকেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী বলে মানা হয়। এই মতানুসারে সৃষ্টিজগতের

সকল কিছু শিবের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ। শিব এখানে শুধুমাত্র দেবতা নন, বরং জগতের একমাত্র পরম চেতন। কাশ্মীর শৈববাদের চারটি প্রধান শাখা ছিল — প্রত্যভিজ্ঞান, স্পন্দ, কৌল ও ক্রম। প্রত্যভিজ্ঞান শাখা মতে, জীব নিজের প্রকৃত স্বরূপ তথা শিবত্বকে চিনতে পারলেই মুক্তি লাভ করে। স্পন্দ শাখা জগতের প্রতিটি আন্দোলনকেই শিবের স্পন্দনরূপে দেখেছে। কৌল শাখা ছিল তন্ত্রকেন্দ্রিক সাধনা ও উপাসনার ধারক। আর ক্রম শাখায় দেবী সাধনা ও যোগের মাধ্যমে মুক্তি লাভের পথ নির্দেশিত।

একাধিক বিদগ্ধ পন্ডিত, মনীষী এই শাখায় বহু ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছেন। কাশ্মীরে শৈব দর্শনের বিকাশে একাধিক মনীষীর অবদান রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বসুগুপ্ত শৈব তন্ত্রের আদি দার্শনিক, যিনি শিবসূত্র রচনা করেন। তাঁর শিষ্য উৎপলদেব প্রত্যভিজ্ঞান দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন অভিনবগুপ্ত (৯৫০–১০২০ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন দার্শনিক, তান্ত্রিক, কবি এবং নাট্যতত্ত্ববিদ। তাঁর রচিত তন্ত্রলোক, প্রত্যভিজ্ঞানহৃদয়ম, অভিনবভারতী ইত্যাদি গ্রন্থ ভারতীয় তন্ত্র দর্শন, শৈববাদ ও রসতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ। তাঁর আগে ভট্ট কল্লট ও সমনন্দ-ও শৈব দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাতা হিসেবে সম্মানিত। এঁরা সকলেই ধর্মতত্ত্ব, সাধনাপদ্ধতি ও দর্শনের এমন সব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, যা পরবর্তী যুগে সমগ্র ভারতের হিন্দু দর্শনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

কাশ্মীর, হিন্দু তন্ত্র সাধনারও এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের বহু পথিকৃৎ সাধকের আবির্ভাব ঘটে। দেবী উপাসনা, শ্রীচক্র পূজা এবং মন্ত্রসাধনা প্রাচীন কাশ্মীরের সাধনাপদ্ধতির মূল অংশ ছিল। কাশ্মীরের হিন্দুধর্মচর্চায় শক্তি বা দেবী উপাসনারও এক বিশেষ স্থান ছিল। এখানকার শারদা দেবী মন্দির (বর্তমানে পাকিস্তান দখলীকৃত কাশ্মীরে) ছিল প্রাচীন ভারতের প্রধান বিদ্যা ও তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পন্ডিত, সাধক ও তান্ত্রিকগণ এই মন্দিরে আসতেন জ্ঞানচর্চা ও তপস্যার জন্য। এছাড়া মার্তণ্ড সূর্য মন্দির, অমরনাথ শিব মন্দির, জৈষ্ঠেশ্বরী মন্দির সহ বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দির কাশ্মীরের ধর্মীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

পরবর্তীতে বহু মঠ, মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় তুর্কি, আফগান সহ একাধিকবার ইসলামিক আগ্রাসনে।

এগুলির পাশাপাশি কাশ্মীরের যোগচর্চাও ছিল অত্যন্ত উন্নত। এখানে সাধকগণ 'উচ্চ যোগ' বা 'ত্রিকা যোগ'-এর মাধ্যমে শিবতত্ত্ব উপলব্ধি করতেন। এই যোগপদ্ধতি কেবল শরীরচর্চা নয়, বরং মন ও চেতনার সর্বোচ্চ উন্নয়নের সাধনা। শুধু ধর্ম-দর্শন নয়, প্রাচীন কাশ্মীর আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কাশ্মীরের খ্যাতনামা আয়ুর্বেদাচার্য চক্রপাণিদত্ত চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা-র টীকা রচনা করেন। এ ছাড়াও ন্যায় দর্শন, সাংখ্য দর্শন, ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পন্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করেন। কাশ্মীর শুধু দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চায়ও অনন্য স্থান অধিকার করেছিল। কালহণ ছিলেন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীরের রাজাদের ইতিহাস সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি ১২০০ বছরের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেন।

কাশ্মীর উপত্যকার অনন্তনাগে অষ্টম শতাব্দীর মার্তণ্ড সূর্য মন্দির।

কাশ্মীরের অবন্তীপুরে শিব ও বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা অবন্তীস্বামী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

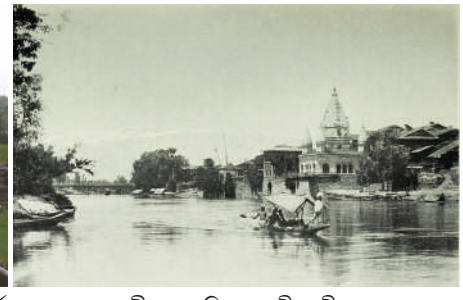

শ্রীনগরে ঝিলম নদীর তীরে রঘুনাথ মন্দির। ১৯১২ সালে তোলা ছবি।

এছাড়া নাট্যতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনাতেও কাশ্মীর বিশেষ অবদান রেখেছে। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র-এর উপর তার অভিনবভারতী টীকা রচনা করেন, যা ভারতীয় নাট্যচিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা।

এরকম আরও হাজারও মণিমুক্তা ছড়িয়ে রয়েছে কাশ্মীরে। যে রত্নাবলীর সময়কাল হাজার হাজার বছরের পুরোনো। সেসব লিখতে গেলে হয়ত কয়েকশ খন্ডে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা লেগে যাবে। তবে কাশ্মীরে জ্ঞান চর্চার পরিসর ধীরে ধীরে কমে আসে ইসলামিক আগ্রাসনের পর থেকে। ধ্বংস করে দেওয়া হয় বহু মঠ, মন্দির, পুড়িয়ে দেওয়া হয় পুঁথি। কাশ্মীর তার নিজস্ব ইতিহাস, গরিমা ভুলতে শুরু করে বা বলা ভালো ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আর কাশ্মীরের হিন্দুত্বের ইতিহাসে শেষ পেরেক পোঁতার কাজটি করেছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং একাধিকবার ভারতে যোগদানের বিষয়ে চিঠি লিখে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করলেও নেহেরু চাননি কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে। নানা টালবাহানায় সময় নষ্ট করেন। পাকিস্তান সুযোগ পেয়ে যায় কাশ্মীর আক্রমণ করার। পরবর্তীতেও নেহেরুর নির্বুদ্ধিতা এবং অপরিণামদর্শীতায় হাতছাড়া হয় কাশ্মীরের অনেকটা অংশ। ৭৫ বছর আগের সেই মূর্খামির মাশুল আজও গুনছে ভারত। পরিণাম ভূস্বর্গ কাশ্মীর যা ঋদ্ধ এক সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল তা বিশ্বের দরবারে সন্ত্রাসবাদের খাতায় নাম তুলছে!

সে মন্দিরে দেব নেই

আছে ভক্তিবিহীন ক্ষমতার দম্ভ

অভিরূপ ঘোষ

আরে এভাবে কি জগন্নাথদেব-কে টেনেহিঁচড়ে পুরীধাম থেকে দীঘাতে নিয়ে আসা যায়? ইচ্ছে করলেই কি আল্পস পর্বত বা দার্জিলিং-এ তৈরি করা যায় আরও একটা কেদারনাথ ধাম? একথা যে উনি জানতেন না তা নয়। তাহলে কেন টানাটানি জগন্নাথ ধাম নিয়ে?

সিনেমা না হলেও একবারে সিনেমার মতই যেমন তাঁর রাজনৈতিক উত্থান তেমনি তাঁর হাত ধরেই বাংলা হা করে দেখল 'ধাম' ধরে টানাটানির অবুঝ বায়না। ভক্তি ও নিবেদনের চাইতেও বেশী বাহুল্য আর ক্ষমতার দম্ভ, আড্ডা, খোশগপ্পো কিন্তু দিনের শেষে ওই এক বায়না- শুধু জগন্নাথদেব নয়, গোটা জগন্নাথধামটাই নাকি তাঁর চাই। অভূতপূর্ব এই শর্ট ফিল্মে সবশেষে ক্লাইম্যাক্স নিয়ে আসবে দৃশ্য ১। শুরু দৃশ্য ২ দিয়ে।

দৃশ্য-২:-

ভরা মিটিংয়ে আহ্বান জানালেন প্রধান পুরোহিত। বললেন, সবাই হাত তুলে বলুন জয় জগন্নাথ। সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন জয় জগন্নাথ। শুধু একজন ছাড়া। হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দিলেন তিনি, তবু প্রভু জগন্নাথের নাম নিলেন না মুখে। অথচ এই কদিন আগে তিনিই ইমামদের পাশে নিয়ে কলমা পড়ে এসেছেন স্বতপ্রণোদিতভাবে। গর্ব করে জানিয়েছেন তিনি রোজা রাখেন। কিন্তু এ যাত্রায় পৃথক ফল। অস্বীকার করলেন 'জয় জগন্নাথ' বলতে। তিনি মমতা ব্যানার্জি।

দৃশ্য-৩:-

খাতায়-কলমে মন্দিরে পুজো শুরু হয়ে গেছে আগেই। পুরোহিত সহ আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে মন্দির চত্বরে ঘুরছিলেন তিনি। মন্দির চত্বর তাই সবাই খালি পায়ে কিন্তু তিনি চটি পড়ে। তিনি মমতা ব্যানার্জি।

দৃশ্য-৪:-

মন্দির চত্বরে তখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলছে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নাটক করতে এসে মন্দিরের মেঝেতে বসে পড়লেন তিনি। সপারিষদ। ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু তাঁর সঙ্গে নেই কোন সাধুসন্ত। বদলে আছেন তারা যারা হিন্দু বিরোধী হিসেবে এ রাজ্যে পরিচিত মুখ। তিনি মমতা ব্যানার্জি।

দৃশ্য-৫:-

মুর্শিদাবাদে দাঁড়িয়ে তিনি। মাইক হাতে। সামনে ভিড় তেমন নেই। জেহাদিদের হাতে খুন হওয়া চন্দন দাস এবং হরগোবিন্দ দাসের পরিবারকে কলকাতা থেকে পুলিশ দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। তিনি হতাশ। কিন্তু ভাঙলেও মচকানোর পাত্রী নন তিনি। অতএব মুর্শিদাবাদেই শুরু হল দীঘার জগন্নাথ মন্দির (সরকারিভাবে কালচারাল সেন্টার) নিয়ে বিস্তৃত মিথ্যাভাষণ। প্রশাসনের সাহায্যে দিনের পর দিন হিন্দু নিধনযজ্ঞ চালানোর পরেও দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে শিখন্ডী করে হিন্দু দরদী সাজার চেষ্টা করলেন তিনি। তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি।

তবে এত কিছুর প্রয়োজন হয়তো হতোই না যদি না ২০১৭ সালে পুরীতে ঘটে যেত এই তালিকার প্রথম ঘটনা।

দৃশ্য-১:-

সেদিন পুরীর জগন্নাথ ধামে মমতা ব্যানার্জির প্রবেশে রীতিমতো বাধা দিয়েছিলেন অনেক পুরোহিত তথা সেবায়েত। যুক্তি স্পষ্ট, পুরীর জগন্নাথ ধামে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এবং পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মত মমতা ব্যানার্জিকেও অহিন্দু মনে করেন তাঁরা। অতএব তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও পুরীর জগন্নাথধাম মন্দিরে ঢুকতে দিতে চান নি তাঁরা। শোনা যায় সেদিনই নাকি মমতা ব্যানার্জি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন পুরীর জগন্নাথধামের নকল করে পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি টাকায় এমন একটা মন্দির করবেন তিনি যার উপর একচ্ছত্র অধিকার থাকবে শুধু তাঁর। অর্থাৎ ভক্তি নয়, মারাত্মক ইগো এবং ভোট ব্যাংকের চাহিদায় এই মন্দির গড়িয়েছেন তিনি!

যদিও খাতায় কলমে একে মন্দির বলা কোনভাবেই উচিত না। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যসরকার কোনভাবেই মন্দির বা মসজিদ বা অন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। রাম মন্দির বা অন্যান্য হিন্দু মন্দিরগুলো যেভাবে ভক্তদের দান করা অর্থে তৈরি হয়েছে সেভাবে মন্দির তৈরি হলে সরকার তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে শুধু। সেই মন্দিরের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকার যেমন অর্থ দিতে পারে না তেমন দক্ষিণা বা দান হিসেবে জমা হওয়া অর্থ সরকার সরাসরি দাবি করতে পারে না। এই ছোট্ট কথাটা মমতা ব্যানার্জির অজানা ছিল না। তাই খাতায়-কলমে দীঘায় যেটা তৈরি হয়েছে তা 'কালচারাল সেন্টার' বা 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র', মন্দির নয়। আর এই কালচারাল সেন্টার তৈরি করেছে হিডকো নামের সংস্থা যার মাথায় বসে মিনি পাকিস্তানের জনক তথা পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরি করার প্রবক্তা ফিরহাদ হাকিম। পাঠককুলের এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কলকাতার এক বিখ্যাত পূজার (চেতলা অগ্রণী) দায়িত্ব সরকার বকলমে এনার কাছেই তুলে দিয়েছেন। তাছাড়া কিছুদিন আগেই এই ফিরহাদ হাকিমকে তারকেশ্বর মন্দির কমিটিরও মাথায় বসানো হয়েছিল।

ফিরহাদ হাকিমকে নিয়ে হয়তো একই রকম পরিকল্পনা এবারেও করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু তা সফল হলো না ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য। দীঘার মন্দিরকে একেবারে পুরীর কপি পেস্ট করতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন হিন্দুদের ঐতিহ্য আর সংস্কারকে। এদিকে পুরীর জগন্নাথ ধাম মন্দিরের বাইরে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে হিন্দু ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি যখন এই কালচারাল সেন্টার কাম মন্দিরের বাইরেও একই লেখা এবং তা রূপায়নের দাবি জানাতে শুরু করল তখন মমতা ব্যানার্জি বুঝলেন তাঁর অতি প্রিয় ফিরহাদকে নিয়ে এ যাত্রায় বেশি লম্ফঝম্ফ করা উচিত হবে না। তাই উদ্বোধনের বিভিন্ন কার্য যেমন আমন্ত্রণ, আপ্যায়ন সমেত বিভিন্ন দায়িত্ব হিডকোর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিমের বদলে প্রথাবিরুদ্ধভাবে তুলে দিলেন নিজের একান্ত অনুগত ভাইস চেয়ারম্যান এইচ কে দ্বীবেদির হাতে। যদিও অহিন্দুদের প্রবেশ নিষেধ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি মন্দিরের বাইরে লাগানো হয়নি। ফলত পুরীর জগন্নাথধামের বিপরীতে গিয়ে বহু সংখ্যক অহিন্দু প্রবেশ করেছেন দীঘার মন্দির।

মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য মন্দিরের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু আগ্রহ নেই। তাঁর ইগো দীঘার মন্দিরকে পুরীর জগন্নাথ ধামের সমতুল্য করে তুলতে হবে। তাই দীঘার কালচারাল সেন্টারের নাম দিলেন 'শ্রীক্ষেত্র দীঘা জগন্নাথধাম'। এখানে বলে রাখা দরকার সনাতনীদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতবর্ষে মূলত চারটি ধাম - বদ্রিনাথ, দ্বারকা, রামেশ্বরম এবং পুরী। এর বাইরেও বৃন্দাবন, অযোধ্যা, বৈদ্যনাথ বা কাশি সমেত কয়েকটি জায়গাকে 'ধাম' বলা হয়। 'ধাম' বলতে সেই জায়গাগুলোকেই বোঝানো হয় যেখানে ঈশ্বর হয় জন্ম নিয়েছিলেন, নয় অধিষ্ঠান করেছিলেন নয় নিজের কোন লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই সনাতনের হিসাবে যে কোন মন্দিরকে ধাম বলা যায় না কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া। ধামগুলোর মধ্যে আবার পুরীর ঐতিহ্য সবথেকে বেশি এবং মনে করা হয় কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখনো পুরীর বিগ্রহের মধ্যে সমাহিত অবস্থায় আছে। রথনির্মাণ, বিগ্রহনির্মাণ, ধ্বজ পরিবর্তন, প্রসাদরান্না থেকে পূজা পদ্ধতি অব্দি সবেই হাজার হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য বহন করছে পুরীর মন্দির। তাই জগন্নাথধাম একটিই এবং সেটি পুরী।

এদিকে প্রশ্ন অনেক। প্রশ্ন উঠছে সরকারি খরচায় তৈরি এই কালচারাল সেন্টার বা মন্দিরের দান এবং দক্ষিণার উপর কার অধিকার থাকবে। সরকারের না মন্দির কমিটির! প্রশ্ন উঠছে সিদ্দিকী সাহেবরা সমেত মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ ইতিমধ্যে দীঘায় যে মসজিদ তৈরির দাবি তুলেছেন সেটাতেও ভোট ব্যাংকের খাতিরে মমতা ব্যানার্জি সমর্থন করবেন কিনা! প্রশ্ন উঠছে কোনোরকম ঐতিহ্য এবং সংস্কার ছাড়াই এভাবে একটা মন্দির তৈরি করে আদতে সনাতনকেই অপমান করা হলো কিনা!

এসবের উত্তর অবশ্য মমতা ব্যানার্জি দেবেন না। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন কিভাবে ভোটের আগে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে এবং পৈতে দেখিয়ে নিজেকে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচয় দেবার পরেও ভোটে পর্যুদস্ত হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তিনি জানেন হিন্দুরা সহনশীল এবং সহিষ্ণু হলেও এতটা বোকা নয় যে মুসলিম তোষণকারী মমতা ব্যানার্জিকে কাছের লোক মনে করে নেবে। তাই দিঘার এই কালচারাল সেন্টার কাম মন্দির মমতা ব্যানার্জিকে ইগো সন্তুষ্টির সুযোগ দিলেও রাজনৈতিকভাবে কোন লাভ দেবে না।

ছবিতে খবর

কলকাতায় ভারতীয় জনতা পার্টির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

যাদবপুর সাংগঠনিক জেলায় অনুষ্ঠিত "এক দেশ এক নির্বাচন" আলোচনা সভায় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্য্য।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৪ জন প্রাণ হারানোর পর বড়বাজারের মেছুয়াবাজার ফলপট্টি এলাকা পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়কগন।

অপারেশন সিঁদুর-এ অংশ নেওয়া ভারতের বীর জওয়ানদের জন্য মন্ডলে মন্ডলে মন্দিরে মঙ্গল প্রার্থনায় বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দরা।

ছবিতে খবর

পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর দাবি জানিয়ে জেলায় জেলায় ডিএম অফিস ঘেরাও এবং ডেপুটেশন কার্যক্রমে বিজেপি জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

অপারেশন সিঁদুর-এ অংশ নেওয়া ভারতের বীর জওয়ানদের জন্য মন্ডলে মন্ডলে মন্দিরে মঙ্গল প্রার্থনায় বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দরা।

ছবিতে খবর

জেলায় জেলায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদের সকল হিন্দু শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন সাধারণ মানুষ সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

তৃণমূলের হাতে খুন হওয়া জেলায় জেলায় ৫৭ জন বিজেপি কার্যকর্তার বিদেহী আত্মার প্রতি বিজেপি নেতা ও কর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জেলায় জেলায় ৫৭ জন বিজেপি কার্যকর্তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনীর হাতে খুন হওয়া বেলেঘাটার একনিষ্ঠ বিজেপি কার্যকর্তা অভিজিৎ সরকারের শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

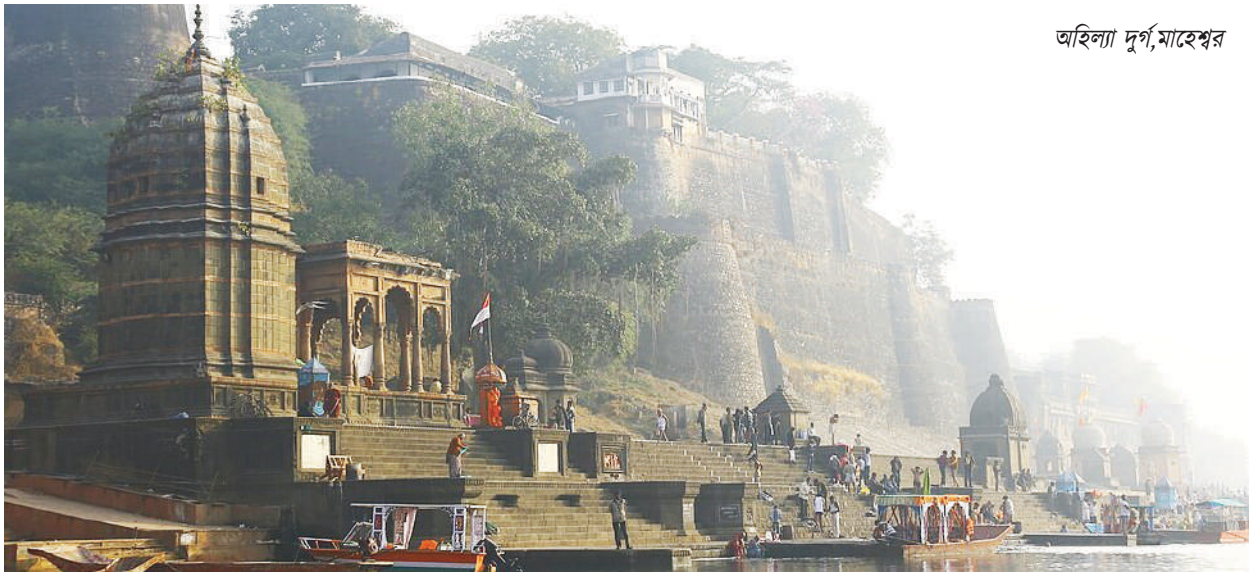

অহিল্যা দুর্গ,মাহেশ্বর

দেবী অহিল্যাবাই হোলকর

এক ভুলিয়ে দেওয়া রাণীর কথা

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃসন্দেহে অহিল্যাবাই হোলকর ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা শাসক- অথচ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর নাম জায়গা পায় না! যেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে তিনি যথাযথ মর্যাদাসহ জায়গা পাবেন- সেদিনই তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভবপর হবে।

অহিল্যাবাই ১৭২৫-এর ৩১-এ মে বর্তমান মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার এক অখ্যাত গ্রাম চৌণ্ডী (Chaundi) তে জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগে নারী শিক্ষার খুব একটা চল না থাকলেও তাঁর বাবা মানকোজি রাও শিন্ডে, যিনি ছিলেন ঐ গ্রামেরই পাতিল, তাকে পড়তে ও লিখতে শেখান। ইতিহাসের পাতায় তাঁর আগমন অনেকটাই আকস্মিক। কিংবদন্তি অনুসারে, মলহর রাও হোলকার, যিনি ছিলেন তখনকার মারাঠা পেশোয়া প্রথম বাজিরাও-এর এক সেনাপতি ও মালবের শাসনকর্তা-তিনি একবার পুনা যাওয়ার পথে এই গ্রামে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। তিনি দেখেন যে, আট বছরের ছোট্ট অহিল্যাবাই গ্রামের মন্দিরে ভক্তিভরে দেবতার কাজ করছে। তিনি এই শিশুকেই তাঁর পুত্রবধূ করবেন বলে স্থির করেন। সেই বছরই ১৭৩৩-এ তাঁর পুত্র খণ্ডেরাও হোলকর এর সঙ্গে এই বালিকার বিবাহ হয়। ১২ ও ১৫ বছর পর তাঁদের যথাক্রমে মালেরাও নামে এক পুত্র ও মুক্তাবাই নামে এক কন্যা হয়।

১৭৫৪-এ একটি দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে খণ্ডেরাও মারা যান। মলহর রাও তাঁর পুত্রবধূকে সতী হতে বাধা দেন। মলহর রাও হোলকরের ১৭৬৬ তে মৃত্যু হলে অহিল্যাবাইয়ের পুত্র মালে রাও হোলকার ইন্দোরের শাসনকর্তা হন। কিন্তু পরের বছর অকালে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। মালবের শাসনভার নিজ হাতে সামলানোর জন্য অহিল্যাবাই পেশোয়ার কাছে আবেদন জানান। মালবেরই কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু হোলকারদের সেনাবাহিনী তাঁর পাশে দাঁড়ায়। কারণ মলহর রাওয়ের শাসনকালেই তিনি বেশ কিছু যুদ্ধে বাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। পেশোয়া তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তিনি মলহর রাওয়ের পালিত পুত্র তুকোজি রাও হোলকরকে সেনাপ্রধান হিসাবে নিযুক্ত করে ১৭৬৭ তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

জরির পাড় বসানো মাহেশ্বরী শাড়ি।

মাহেশ্বরে লোকমাতা অহিল্যাবাইয়ের প্রস্তরমূর্তি।

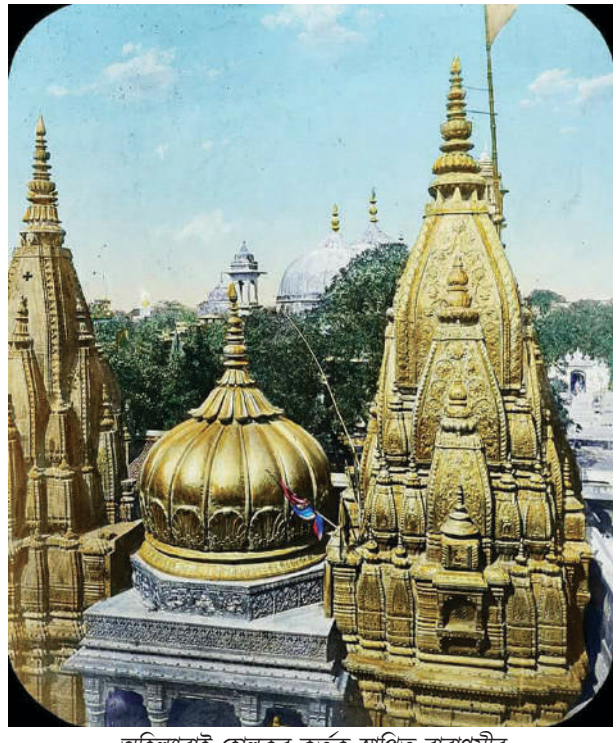

অহিল্যাবাই হোলকর কর্তৃক স্থাপিত বারাণসীর বর্তমান কাশী বিশ্বনাথ মন্দির।

অহিল্যাবাইয়ের অসংখ্য কৃতিত্বের মধ্যে একটি হল যে তিনি ইন্দোরকে একটি ছোট মফঃস্বল থেকে সমৃদ্ধশালী ও সুন্দর শহর হিসাবে গড়ে তোলেন। ইন্দোর ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় তাঁর আমলে। অহিল্যাবাই রাজধানী স্থাপন করেন নর্মদা নদীর তীরবর্তী একটি প্রাচীন ছোট্ট শহর মাহেশ্বরে। এখানে নর্মদা নদীর তীরে তিনি একটি বিশাল শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলেন। এছাড়াও সমগ্র মালবেই তিনি বহু দুর্গ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তিনি বণিক ও কৃষকদেরও আর্থিক উন্নতিতে উৎসাহ দিতেন এবং কর বা অন্য কোন ধরণের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার তাদের সম্পত্তিতে তাঁর আছে বলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি রাজকোষকে রাজপরিবারের ব্যবহারের থেকে পৃথক করেন। তাঁর ব্যক্তিগত খরচ চলত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি এবং তাঁর নিজস্ব জমিজমা থেকে। মাহেশ্বরে তাঁর রাজধানী সেই সময়ের ভারতের সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ভাস্কর ও শিল্পী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তিনি মাহেশ্বরে একটি বস্ত্র কারখানাও গড়ে তোলেন। এর জন্য তিনি বুরহানপুর থেকে কিছু তাঁতিও নিয়ে আসেন- মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হলে বুরহানপুরের হস্তচালিত তাঁত শিল্পেরও অবনতি হয়। এর পরিবর্তে মাহেশ্বরকে তিনি তাঁত শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। মাহেশ্বরী শাড়ির এখনও যথেষ্ট কদর আছে।

অহিল্যাবাই মালবে বিভিন্ন উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বহু মন্দিরে নিয়মিত পূজার্চনার জন্য নিয়মিত দান করতেন। মালবের বাইরেও হিমালয় থেকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থকেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকায় বহু মন্দির, ঘাট, কুয়ো, জলাশয় এবং সরাইখানা নির্মাণ করেন। বহিরাগত ইসলামিক শাসনে মুসলমানদের হাতে যে হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়েছিল তার মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরকে তিনি পুনর্নির্মাণ করেন। এর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিল বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ- যা পূর্বে মোট তিনবার মুসলিম শাসকদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শেষবার ধ্বংস করেন মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে তার স্থলে ঔরঙ্গজেব জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে মলহর রাও হোলকার জ্ঞানবাপী মসজিদটি ধ্বংস করে পুরনো স্থানেই বিশ্বেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ

বারাণসীর অহিল্যাবাই ঘাট।

করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু লখনউ-এর নবাবের বাধা ও আরও কিছু কারণে তিনি তাঁর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে পারেননি। শেষপর্যন্ত তাঁর পুত্রবধূ অহিল্যাবাই বর্তমান মন্দিরটি ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন, তার ধ্বংসের ১১১ বছর পর। তিনি গোটা ভারতে কয়েক'শ মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করেন। তিনি কাশী, গয়া, সোমনাথ, অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাঞ্চি, অবন্তী, দ্বারকা, বদ্রিনারায়ণ, রামেশ্বর এবং জগন্নাথপুরী প্রভৃতি জায়গাকে সাজিয়ে তোলেন। ২৮ বছর শাসনের পর ১৭৯৫-এ অহিল্যাবাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে লিখেছেন, "The reign of Ahilyabai, of Indore in central India, lasted for thirty years. This has become almost legendary as a period during which perfect order and good government prevailed and the people prospered. She was a very able ruler and organizer, highly respected during her lifetime, and considered as a saint by a grateful people after her death." স্কটিশ কবি ও নাট্যকার জোয়ানা বেইলি (Joanna Baillie) ১৮৪৯-এ তাঁর ওপর একটি ইংরাজি কবিতা লেখেন-

ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৯৬ সালে অহিল্যাবাই হোলকরের ওপর ডাকটিকিট প্রকাশ।

"For thirty years her reign of peace,
The land in blessing did increase;
And she was blessed by every tongue,
By stern and gentle, old and young.
Yea, even the children at their mother's feet
Are taught such homely rhyming to repeat
In later days from Brahma came,
To rule our land, a noble Dame,
Kind was her heart, and bright her fame,
And Ahlya was her honoured name."

জন কি (John Keay) তাঁকে 'The Philosopher Queen' বলে অভিহিত করেছেন। জন ম্যালকম (John Malcom) যাঁকে ১৮২০-র দশকে সরকারী কাজে মধ্য ভারত ঘুরতে হয় তিনি সেই অঞ্চলের মানুষদের কাছে মৃত্যুর এত বছর পরও অহিল্যাবাই হোলকারের জনপ্রিয়তা দেখে বিস্মিত হন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'A Memoir of Central India'-তে লেখেন, "With the natives of Malwa···her name is sainted and she has styled an avatar on incarnation of the Divinity. In the soberest view that can be taken of her character, she certainly appears, within her limited sphere, to have been one of the purest and most exemplary rulers that ever existed." মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার লেখেন, "From the original papers and letters, it becomes clear that she was the first-class politician, and that was why she readily extended her support to Mahadji Shindhia. I have no hesitation in saying that without the support from Ahilyabai, Mahadji would have never gained so much importance in the politics of northern India."

অহিল্যা দুর্গের ভিতরেও ছিল মন্দির।

১৯৯৬-এর ২৫ অগাস্ট অহিল্যাবাইয়ের সম্মানার্থে ভারত সরকার ডাকটিকিট চালু করে। ১৯৯৬ সালে ইন্দোরের কিছু প্রভাবশালী নাগরিক অহিল্যাবাইয়ের স্মৃতির সম্মানার্থে প্রতি বছর তাঁর নামে কোন গুণী ব্যক্তিকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ভাবেন। প্রথম বছরের পুরস্কারটি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী তুলে দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রচারক ও প্রখ্যাত সমাজসেবক নানাজী দেশমুখের (যিনি ২০১৮ সালে ভারতরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন) হাতে। লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন অহিল্যাবাইয়ের ওপর 'মাতোশ্রী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ২০০২-এ 'দেবী অহিল্যাবাই' নামে একটি চলচ্চিত্রও তৈরী করা হয়। ইন্দোরের বিমানবন্দরটির নাম হল দেবী অহিল্যাবাই হোলকার বিমানবন্দর। তাঁর নামে ইন্দোরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও (দেবী অহিল্যা বিশ্ববিদ্যালয়) আছে। এসব সত্ত্বেও একথা বলতে কোন বাধা নেই যে খুব কম শিক্ষিত ভারতবাসীই অহিল্যাবাই হোলকার ও তাঁর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা শাসক- অথচ কোন এক অজ্ঞাত কারণে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর নাম জায়গা পায় না। যেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে দেবী অহিল্যাবাই হোলকর- তাঁর যথাযথ মর্যাদাসহ জায়গা পাবেন- সেদিনই তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভবপর হবে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে হিন্দুত্ব

সৌভিক দত্ত

"বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল.....তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি"। -সর্বনাশ করেছে! রবিঠাকুরের কথার সঙ্গে যে হিন্দু হিন্দু এক হও বা বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে স্লোগান মিলে যাচ্ছে!

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো, / এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতার দুই পংক্তি। এবং বর্তমানে স্বঘোষিত সেকুলার বলে দাবি করা বামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা বহুল ব্যবহৃত পংক্তি। আর বামপন্থী ও জিহাদীদের স্বাভাবিক শত্রু হিন্দুত্ববাদ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই ন্যারেটিভের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে হিন্দুরাই।

কিন্তু এই পংক্তিগুলো পড়ার সময় কারও কোনো খটকা লাগেনি? যে, রবীন্দ্রনাথ এমন লিখলেন? রবীন্দ্রনাথ? যে রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীর জহরব্রতকে নিয়ে লিখতে পারেন, - স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্রে/ সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ / রাজপুত-সতী আজিকে কেমন/ সঁপিছে পরান অনলশিখে।

তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম বন্দেমাতরমে দেশকে কল্পনা করেছিলেন মা দুর্গা হিসাবে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দেশ কে কল্পনা করেছিলেন মা কালী হিসেবে। কোথায়? এই কবিতায় - ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,/ বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। / দুই নয়নে স্নেহের হাসি,/ ললাট নেত্র আগুনবরণ।

বা, ১৬ই অক্টোবর,১৯৩৩ এ হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন -

"দেশের অসীম দুর্গতির কথায় মন যখন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তখন চুপ করে থাকতে পারিনে। ধর্মে ও নিরর্থক আচারে হিন্দুকে শতধা বিভক্ত করে রেখেছে। বিদেশির হাতে তাই পরাভবের পর পরাভব ভোগ করে আসছি। অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে আমাদের হাড় জীর্ণ। মুসলমান ধর্মে এক, আচারে এক, বাংলার মুসলমান, মাদ্রাজের মুসলমান এবং ভারতবর্ষের বাইরের মুসলমান, সমাজে সবাই এক, বিপদে-আপদে সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারে, এদের সঙ্গে ভাঙাচোরা হিন্দুজাত পারবে না। আরও একবার পাঠানদের হাতে কানমলা খাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে।"

(বাংলা সাপ্তাহিক স্বস্তিকার ২১-৬-১৯৯৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত।)

এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক তাঁর এই কথাগুলো?

১/"যে মুসলমানকে আজ ওরা প্রশ্রয় দিচ্ছে সেই মুসলমানেরাই একদিন মুষল ধরবে। "(অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা চিঠি, ১৫.১১.১৯৩৪, চিঠিপত্র:১১)।

২/ "চল্লিশলাখ হিন্দু একলাখ মুসলিমদের ভয়ে মারাত্মকভাবে অভিভূত। " (আনন্দবাজার পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, ৫.৯.১৯২৩)।

৩/"যদি মুসলমান সমাজ মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা।"(রবীন্দ্র রচনাবলী, জ.শ.স,১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭,কালান্তর)।

৪/ "কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন হলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে।"(রবীন্দ্র রচনাবলী, জ.শ.স, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭,কালান্তর)।

৫/ "এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিস্যাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।"(রবীন্দ্র রচনাবলী, জ.শ.স, ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৮,শান্তিনিকেতন)।

৬/"ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে।"(ঐ, পৃষ্ঠা ৪৮৫,ইতিহাস)।

৭/"প্রতিদিন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান এবং খৃস্টান হতে চলেছে। কিন্তু ভাটপাড়ার চৈতন্য নেই। একদা ঐ তর্করত্নদের প্রপৌত্রীমণ্ডলীকে মুসলমান যখন জোর করে কলেমা পড়াবে তখন পরিতাপ করার সময় থাকবে না।"(হেমন্তীবালা দেবীকে লেখা চিঠি, ১৬.১০.১৯৩৩,চিঠিপত্র-৯)। এতদিন সিলেক্টিভ ভাবে তুলে আনা বাম ন্যারেটিভে তৈরী রবীন্দ্রনাথ দর্শনের সাথে আর কোনো মিল পাচ্ছেন কি? তাহলে আরো কিছু দেখানোর আছে আপনাদের।

এবার চলুন, মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো স্বাধীনতাযোদ্ধা ছত্রপতি শিবাজি মহারাজাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন দেখে নি একটু।

.....হে রাজা শিবাজি,/ তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ/ এসেছিল নামি —/ 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত/ বেঁধে দিব আমি।'

"ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে" দেওয়ার প্রচেষ্টার বন্দনা যিনি করেছেন, তিনিই আজ হয়ে গেলেন টুকরে গ্যাং এর দেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অস্ত্র! ইতিহাস কি অদ্ভুত রসিক!

কিংবা রবীন্দ্রনাথের আরেকটি মজার লেখাংশ পড়বেন?

"বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (লোকসাহিত্য, পৃষ্ঠা ১২০)।

সত্যি করে বলুন তো যদি না বলে দেওয়া হয় যে লেখাটা রবীন্দ্রনাথের, তাহলে তথাকথিত সেকুলাররা এই লেখাটিকে আরএসএস বা বিজেপি প্রভাবিত কারো লেখা বলে বাতিল করে দেবে না?

আবার, হিন্দুদের উপর আক্রমন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"... আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থানের বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন যে। এমনকি হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আইনমতে প্রত্যেক জেলে পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত।.... বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও মুক্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এইজন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্পুর বেলা / ভূতে মারে ঢেলা।

(অগ্রহায়ণ ১৩৩০, বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিত সমস্যা প্রবন্ধের অংশ; কালান্তর গ্রন্থে সন্নিবেশিত)।

এমনই আরও একটি ইন্টারেস্টিং লেখা দেখুন-

"একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে বস্তুতঃ অসম্ভব করে রেখেছে - তা হল মুসলমানেরা কখনও কোনো একটা দেশের আনুগত্য স্বীকার করে না। মুসলমানদের আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছি কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ভারত আক্রমণ করলে ভারতের মুসলমানরা ভারতের হিন্দুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদেশি মুসলমানদের সাথে লড়বে কিনা। তাদের উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এমনকি মহম্মদ আলির (খিলাফত আন্দোলনের নেতা, আলি ভাতৃদ্বয়ের একজন) মতো মানুষও ঘোষণা করেছেন যে কোনো অবস্থাতেই, কোনো দেশের মুসলমানরাই কখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না - এটা মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ।" - (টাইমস অফ ইন্ডিয়া সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিঃ ১৮-৪-১৯২৪)।

কিংবা যখন ব্রাহ্ম ধর্মকে মূল হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা হয়েছিল বৌদ্ধ কিংবা শিখদের বিচ্ছিন্ন করার মতো, তখন রবীন্দ্রনাথ কী মতামত দিয়েছিলেন? - ''বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। ···ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। ··· অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়)।

কী? চিনতে অসুবিধা হচ্ছে তো এতদিন ধরে চিনিয়ে আসা রবীন্দ্রনাথকে?

আরো একটা মজার তথ্য দিই? রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে জেহাদী তান্ডব বৃদ্ধি পেলে তিনি সেখানে বাংলার আদি মার্শাল কাস্ট নমঃশূদ্র দের এনে বসান প্রতিরোধের জন্য।

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ তার "ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত" বইয়ের পৃষ্ঠা ২৬৯-২৮৪ তে এই নিয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে লিখেছেন, "মুসলমান প্রজাদের চিট করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল।''

এবার রবীন্দ্রনাথের আরও দুটো লেখাংশ তুলে দিই?

১/ ''কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ডহস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষটা বিশেষরূপে ইংরাজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়; কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া। পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কণ্ঠরোধ)।

২/ 'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থবৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রীতিমত নভেল)।

কী? ধাক্কা লাগছে?

যাগকে, রবীন্দ্রচর্চা অনেক হলো। ভবিষ্যতেও হবে। আর শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, সমস্ত মনীষীদেরই উপরে চাপিয়ে দেওয়া সেকুলারি

আচ্ছাদন সরিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী আসল চেহারা সবার সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

তো ফিরে আসি একেবারে মূল বিষয়ে। ধর্মের বেশে মোহ ..... তাইতো?

আচ্ছা কবিতাটা কবে লেখা হয়েছিল? কবিতাটার প্রেক্ষাপট কি? যে কোনও সাহিত্য বা কোটেশনের ক্ষেত্রেই তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা গুরুত্বপূর্ণ।

কবিতাটা লেখা হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১৪ ই মে।

দুই বাংলা জুড়ে চলছে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক অত্যাচার! পূর্ব বাংলায় পটুয়াখালীতে অলরেডি সরস্বতী পুজো নিয়ে ধুন্ধুমার হয়ে গেছে।

এইসময়ে বরিশাল কলেজে সরস্বতী পুজোতে বাধাদান করা হয়, পুজো না করার নির্দেশ আসে স্থানীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের থেকে। বহু চেষ্টার পরও নিজেদের এত বছরের প্রতিবেশীদের মন গলাতে না পেরে কলেজের মধ্যে পুজো না করে হিন্দু ছাত্ররা তাদের হোস্টেলের মধ্যে পুজো সম্পন্ন করেন। ... এদিকে শান্তিভঙ্গ হয়েছে এই অপরাধে সমস্ত হিন্দু ছাত্রদের পুলিস গ্রেপ্তার করে, ততক্ষণে অবশ্য পুজো সম্পন্ন হয়ে গেছিল। (সূত্র- তমাল দাশগুপ্ত, সপ্তডিঙা)।

আবার একইসময় পটুয়াখালীর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে একই কায়দায় সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়া হয়। স্কুল গৃহে না করে, পুজো সম্পন্ন করা হয় স্কুল প্রাঙ্গনে। পরের দিন সরস্বতী মূর্তির সামনে একটি গরুর কাটা মাথা পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর পরেই সরস্বতী পুজোয় বিসর্জনের শোভাযাত্রা বন্ধের দাবী করা হয়। কারণ শোভাযাত্রা যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথে একটি মসজিদ ছিল (ঠিক সেই রাজপথের ওপরে নয়, রাজপথ থেকে বেরোনো একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথের শেষ প্রান্তে ছিল এই মসজিদ)। মসজিদের প্রার্থনার সময় তার সামনে দিয়ে যাওয়া কোনও শোভাযাত্রায় কোনও বাজনা বাজানো হবে না, এই আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সরস্বতীর বিসর্জনযাত্রার অনুমতি দেওয়া হল না। একইভাবে ১৯২৬ সালে অগাস্ট মাসে জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রাতেও হামলা চালানো হয়, পুলিস এসে শোভাযাত্রা আটকে দেয়, এবং শুধু হিন্দুদেরকেই শান্তিভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে সেখানে শুরু হয় পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ।

আর পশ্চিমবঙ্গে তিন খেপে মোট এগারোটি দাঙ্গা হয়েছিল গোটা '২৬ সাল জুড়ে। প্রথম দফাটা ২ থেকে ১৪ই এপ্রিল, দ্বিতীয় ২২ শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে আর তৃতীয় ১১-২৫ শে জুলাই পর্যন্ত। পকারণ ছিলো যথাক্রমে মসজিদের সামনে গান বাজানো যাবেনা বলে ফতোয়া, মেছুয়াবাজার, কটন স্ট্রিটে হিন্দুদের উপর আক্রমণ আর মসজিদের সামনে হিন্দুদের শোভাযাত্রায় বাঁধা দেওয়া। মতওয়ালা সুলতান, হানাফি, জামায়াত, মহাম্মদী (উর্দু), আসর-ই জাদিদ (আরবী), ইসলাম জগত (বাংলা) প্রভৃতি সংবাদপত্র গুলো ক্রমাগত উস্কানিমূলক লেখা লিখে দাঙ্গায় মদত দিতে থাকে। নিয়মিত আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এই সময়েই ঠনঠনিয়া (ঠনঠনে) কালীবাড়ি মন্দিরের উপর আক্রমনের চেষ্টা করা হয়। এই আক্রমন যারা প্রতিরোধ করেছিল, সেই যুব সমাজের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখেছিলেন রসরাজ অমৃত লাল বসু - "বাজিল দীপক রাগ যুবক জীবনে" আবার ১৯৪৬ এর দাঙ্গার পর সেই কবিতাটিকে পুনরায় ছাপানো হয় "পরাগ "নামে একটি পত্রিকাতে। উদ্দেশ্য ছিলো যুবকদের অতীতের গরিমার কথা মনে করিয়ে দিয়ে জেহাদ প্রতিরোধে উজ্জীবিত করা।

এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে, যখন এপার বাংলা- ওপারে বাংলা দুই জায়গাতেই হিন্দুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে, সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ঠনঠনিয়া আক্রান্ত হচ্ছে, ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর আঘাত আসছে, হিন্দু ছাত্রদের পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে - সেই সময় চিরকাল হিন্দুদের মঙ্গল চেয়ে আসা (উপরে দেওয়া তথ্যসূত্র সহ রবীন্দ্রনাথের কোটেশন গুলো আরেকবার পড়ুন) কবিগুরু "ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে" ঠিক কোন সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করে লিখেছিলেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

কিন্তু আজ তার সেই কবিতাই ব্যবহৃত হচ্ছে তার নিজেরই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে। কেন? আমাদের ইতিহাস বিমুখতা ও যথাযথ রবীন্দ্রচর্চার অভাবের কারণে!

পুনঃ সেই বছরেরই শেষের দিকে (২৩ শে ডিসেম্বর) আবদুল রশিদ হত্যা করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে। এই মহামানবের মৃত্যুতে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

"বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব মুসলমান মারে আর আমার পড়ে পড়ে মার খাই - তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের (মুসলমানদের) কাছে আপিল করতে পারি,, তোমরা ক্রূর হয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। - কিন্তু সে আপিল দুর্বলের কান্না।" - (মাঘ ১৩৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধের অংশ যা কালান্তর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে)।

তো এই গেলো মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের আখ্যান। কবিগুরুর উপর কৃত্রিম সেকুলারি লেবাস সরানোর অতি সামান্যতম একটি প্রচেষ্টা! এবার আমাদের দায়িত্ব আমরা সেকুলার রবীন্দ্রনাথকে নেব নাকি আসল হিন্দু রবীন্দ্রনাথ থেকে গ্রহণ করব।

কবি কি বলে গেছেন? শোনেননি?

"সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার / উদ্বেগে তাকায়ো না বাইরে"

ওয়াকফ সম্পত্তি আইন বাতিল

বর্তমান সময়ের দাবী

রণদৃপ্ত শীল

ওয়াকফ সংশোধনী আইন সম্পর্কে মুসলিম সমাজের বহুলাংশ জানেই না! জানলে পরে তারা বুঝতো যে এই আইনে সবচেয়ে অধিক লাভবান হয়েছে মুসলমানরাই। শুধুমাত্র কিছু মুসলিম নেতা ও ধর্মগুরু কর্তৃক ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল মুসলমান তৌহিদী জনতা! এ রাজ্য তার ভয়াবহ রূপ দেখেছে।

৩রা এপ্রিল ২০২৫- অনেক ঝড় ঝাপটার পর অবশেষে শাসকদল NDA-এর ২৮৮ ভোটের জোরে সংসদে পাশ হল ওয়াকফ সংশোধনী আইন। কিন্তু ওয়াকফ কি? ওয়াকফের উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ 'ওয়াকাফা' থেকে, যার অর্থ হলো আটক রাখা। ইতিহাস অনুযায়ী, নবী মহম্মদের অনুগত, খলিফা ওমর একবার খাইবারে বিশাল জমি কিনে মহানবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিভাবে তিনি এই জমির সদ্ব্যবহার করতে পারেন! তখন নাকি মহম্মদ বলেছিলেন এই জমি মজহব (ধর্ম) ও মানুষের মঙ্গলার্থে ব্যবহার করতে! সেই থেকে ইসলাম ধর্মের একটি প্রথা হল নিজের কোন সম্পত্তি, সে জমি হোক বা বাড়ি, "মাজহাবি" উদ্দেশ্যে দান করা। এই প্রথার নাম ওয়াকফ। এই দান করা ওয়াকফ সম্পত্তি পরে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের হিতার্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে ইসলামিক দেশগুলোতে ওয়াকফ সম্পত্তির উপর তৈরী হয়েছে এক একটি সুদৃশ্য নয়নাভিরাম ইমারত। কিন্তু এই ওয়াকফ প্রথা যে কতটা ভয়ংকর এবং কি পরিমাণ স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দিতে পারে তার ভুক্তভোগী ভারতবর্ষ!

ভারতে এই ওয়াকফ প্রথার সূত্রপাত ঘটে ইসলামিক শাসকদের আগমনের সাথেই। ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের নিমিত্তে আক্রান্ত হিন্দুদের ঘর বাড়ি ও মন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে ওঠে শাহী ইমারত, মসজিদ, মাজার - যা ভবিষ্যতের ওয়াকফ সম্পত্তি। এভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তির নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দখলীকৃত হয়ে রইল সনাতনী হিন্দুদের জমিজমা। কালের নিয়মে এবার ক্ষমতার লাগাম এসে পড়ে ইংরেজদের হাতে। অদ্ভুত ভাবে ভূতপূর্ব ইসলামিক শাসকদের প্রবর্তিত এই ওয়াকফ প্রথা বাতিল না করে Mussalman Wakf Validating Act-এর মাধ্যমে এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় ইংরেজ শাসকগণ। সম্ভবত তারা এই ওয়াকফ ব্যবস্থা শেষ করে মুসলমানদের চটানোটা বাঞ্ছনীয় বোধ করেননি। কারণ তাদের ঐক্য শক্তি। এই ঐক্য শক্তির জোরেই ততদিনে শাসকদলের একটি লোভনীয় ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে মুসলমান জাতি। ক্ষমতা দখলের নিমিত্তে ভোটব্যাঙ্কের লোলুপতা থেকে যায় স্বাধীনতার পরেও। তার প্রমাণ ১৯৫৪ সাল। স্বাধীন "হিন্দুপ্রধান" ভারতের সরকার মুসলিম ঐক্যের সম্মুখে নতমস্তক হয়ে ওয়াকফ আইন (Waqf Act, 1954) প্রণয়ন

করে একটি ইসলামিক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা কে মেনে নিল। হাতে চাঁদ পেল এক বিশেষ সম্প্রদায়। সমস্ত মসজিদ, গোরস্থান, মাজারগুলি রাতারাতি "ওয়াকফ সম্পত্তি" ঘোষিত হতে লাগল। ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক বন্টনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড তৈরী হল। ওয়াকফ দেখাশোনার দায়িত্বে যে থাকে, তাকে মুত্তাওয়ালী বলা হয়। এভাবেই সেকুলারিজমের আদর্শে সম্পৃক্ত (সেকুলারিজম্ তখনো কাগজে-কলমে ভারতের সংবিধানে স্থান লাভ করেনি) ভারতবর্ষের মাটিতে ভারত সরকার দ্বারা স্বীকৃতি ও বৈধতা লাভ করলো মধ্যযুগীয় এই ইসলামিক প্রথা! এতে বৃদ্ধি পেলো ওয়াকফ বোর্ডের দাপট ও ক্ষমতার ক্ষিদে। মুসলমানরা, প্রধানত ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরা, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এবার চাপ সৃষ্টি করল ওয়াকফ সম্পত্তি আইনের আরও সংশোধনের জন্য। কারণ তাদের আরো ক্ষমতা চাই! সরকারও ভোটব্যাঙ্কের লোভে বারংবার তাদের প্রতি নির্লজ্জ চাটুকারিতায় মত্ত হল এবং হিন্দু সমাজের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করতে থাকলো! সনাতনী সমাজের উপর এরপরে কোপ মারলেন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৫ সালের সংসদে পাস হল এক নতুন ওয়াকফ আইন। অ্যাডভোকেট প্রসূন মৈত্রের "ওয়াকফের করালগ্রাস" থেকে জানা যায়, তৎকালীন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা সোনিয়া গান্ধীর চাপেই এ কাজ করেছিলেন তিনি। এই আইন ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে আরো অধিক ক্ষমতা প্রদান করল। ওয়াকফ বোর্ডগুলির সুচারু কার্য পদ্ধতির জন্য গড়ে উঠল ট্রাইবুনাল। ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই ট্রাইবুনালই নেবে। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের পর্যন্ত ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের ধারা নং ১৪ (বিধি সমক্ষে সমতা) ও ১৫ (জাতি, প্রজাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ও জন্মস্থানের হেতুতে বিভেদের প্রতিষেধ)-র কার্যত পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছিল ওয়াকফ সম্পত্তি আইনের সম্মুখে।

ওয়াকফ বোর্ডের অত্যাচারের সীমা অতিক্রান্ত হয় ২০২২ সালে। সেই বছর তামিলড়ুর তিরুচেন্দুরাই গ্রামের মানুষজন একদিন জানতে পারে, গ্রামের প্রখ্যাত চন্দ্রশেখা স্বামী মন্দির সহ তাদের গোটা গ্রাম ওয়াকফ জমির ওপর নির্মিত আর ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে! অর্থাৎ এই গ্রামের কেউ তাদের বিক্রি করতে পারবে না! জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরামর্শ, বলা ভালো, রফা করতে হবে ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এরকম ঘটনা নজিরবিহীন! এভাবেই যখন তখন যে কোন জমি বা সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে, যার দরুন সৃষ্টি হচ্ছে নানারকম আইনি জটিলতা। প্রখ্যাত লেখক ও বিজ্ঞানী ডঃ আনন্দ রঙ্গনাথনের বই "Hindus in Hindu Rashtra" থেকে জানা যায়, "Waqf board is the third largest landowner in India, after Army and Indian Railways." এর থেকে সহজেই অনুমেয় ওয়াকফ বোর্ডের প্রভাব ও দাপট কতটা! মুসলমান নেতৃবর্গের অনেকের বক্তব্য, তারা সংখ্যালঘু, তাই এই বোর্ডের প্রয়োজন তাদের! খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদী, এদের জন্য তো কোন ধর্মীয় বোর্ড নেই! যুক্তি যতটা হাস্যকর বাস্তব ততটাই ভয়ঙ্কর! এই বোর্ডে নিজস্ব সার্ভেয়ার, কাজি, মুত্তাওয়ালী, সবাই মুসলিম। দেশের অন্য কোন অমুসলমান সরকারি আধিকারিকের এখানে কোন জায়গা নেই। মুসলিম সম্পত্তি দেখাশোনার নামে ওয়াকফ বোর্ড কার্যত একটি সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে।

এই Waqf Amendment Act মানুষের মনে কিঞ্চিত আশার আলোর উদ্রেক করেছে। এর চুলচেরা বিশ্লেষণ নিরর্থক। এই দুরূহ কাজটি অ্যাডভোকেট প্রসূন মৈত্র পূর্বেই সমাধা করেছেন। এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠক পাঠিকা তাঁর লেখা "ওয়াকফের করালগ্রাস" বইটি পড়তে পারেন। তবে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের ফলে ওয়াকফ বোর্ডের দাপট অনেকটাই লাঘব হয়েছে। আগের মত যখন তখন কোন জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা যাবে না! তার ঐতিহাসিক নথিপত্র প্রমাণ হিসেবে দেখাতে হবে সরকারকে। কোন এলাকার জমি ওয়াকফ সম্পত্তি কিনা, তা বিচার করবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টর, কোন কাজী বা ইসলামিক ধর্মগুরু নয়।

কিছু মুসলিম নেতা ও ধর্মগুরু কর্তৃক ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে পথে নামলো মুসলমান তৌহিদী জনতা! আর এরপর ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ দেখল তাদের তথাকথিত প্রতিবাদের এক ভয়াবহ চিত্র! শুরু হল সনাতনীদের খুন, নারীদের ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর! মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান আর সামশেরগঞ্জ আজ জ্বলছে! হিন্দুরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ফের উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে মালদার উদ্বাস্তু শিবিরে! মজার কথা হল, এই ওয়াকফ সংশোধনী আইন সম্পর্কে মুসলিম সমাজের বহুলাংশ জানেই না! জানলে পরে তারা বুঝতো যে এই আইনে সবচেয়ে অধিক লাভবান হয়েছে মুসলমানরাই। ওয়াকফের ব্যবহার দরিদ্র মুসলমানদের হিতার্থে ব্যবহার হবে, এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও গরিব পাসমান্দা মুসলমানরা ওয়াকফের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল এতদিন। ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরা মূলত ছিল আশরাফ সম্প্রদায়ের। সে জন্য ওয়াকফ সম্পত্তির সুবিধে ও সুযোগ তারা পাইয়ে দিতো ধনী আশরাফদের। এটা সমস্যার সমাধান না! একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভালো মন্দ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের ধর্মীয় বোর্ড কখনোই থাকতে পারে না! কারণ ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সকলের প্রাণ ও মান রক্ষার দায়িত্ব সে দেশের সরকারের। দেশের সংবিধান সেই অধিকার আমাদের সকলকেই দিয়েছে, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। কাজে এই সমস্যার সমাধান একটাই। এই সর্বনাশা Waqf Act কে সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি আইন বাতিল আজ সময়ের দাবী!

দীপক ঘোষ-কে যেমন দেখেছি

পুলক নারায়ণ ধর

প্রখর স্মৃতিধর দীপক ঘোষ- শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন অটুট স্মৃতির অধিকারী। আত্মজীবনী লিখবার জন্য বহু অনুরোধ তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছিলেন আগে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে সে সম্বন্ধেই বলা দরকার। এবং এই মিথ্যাচারী ব্যক্তিটির আগে মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার।

গত ৭ মার্চ দীপক কুমার ঘোষ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে দীপক কুমার ঘোষ একটি বিশিষ্ট নাম। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। সরকারি আধিকারিক দীপক কুমার ঘোষ ছিলেন দক্ষ আইএএস অফিসার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। অবসর গ্রহণের দু'বছর আগেই তিনি চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

তখন সিপিএমের প্রতাপ চলছে। কংগ্রেস ভেঙেছে তৃণমূল তৈরি হয়েছে। সেই সময় তিনি যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সারা পশ্চিমবঙ্গ তিনি উদভ্রান্তের মতন ঘুরে বেরিয়েছেন সংগঠন তৈরি করবার জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি ছিলেন একজন প্রধান উপদেষ্টা যদিও মমতা খুব একটা উপদেশের ধার ধারতেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো রচনা ছিল তার হাতের কাজ। মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে দীপক কুমার ঘোষ ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম বিধায়ক। পরবর্তীতে তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। একসময় তৃণমূল কংগ্রেস দল থেকে পদত্যাগ করে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন।

এসব হল দীপক কুমার ঘোষের বাহ্যিক পরিচয়। রাজনৈতিক দীক্ষা ও ব্যক্তি হিসেবে তার পরিচয় অনেক ব্যাপক ও গভীর যা বহু মানুষের অজানা। মানুষ হিসাবে তিনি অনেক বড় মাপের। দীপক কুমার ঘোষ-কে আমি দেখেছি তার সর্ব ব্যাপকতায় রাজনীতি ও তার বাইরের পরিধিতে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ২০০৫ সালে। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের পতনের প্রকাশ

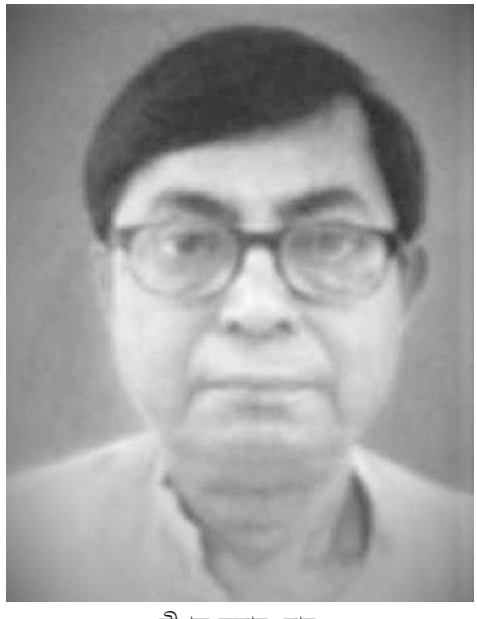

দীপক কুমার ঘোষ

পেতে শুরু করেছে। মানুষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস অর্জন করছে। জ্যোতি বসু আর মুখ্যমন্ত্রী নেই। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যার অদূরদর্শিতা এবং হঠকারী নীতির জন্য সিঙ্গুর সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সিঙ্গুর নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সিপিএম যে গা জোয়ারি করে মারাত্মক ভুল করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুরো মাশুল তুলেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দীপক ঘোষের ভূমিকা ছিল বিরাট।

তিনি সর্বদাই থাকতেন নেপথ্যে। সেসময় মমতার পাশে কোন আগ মার্কা intellectual-কে দেখা যায় নি। সুনন্দ সান্যাল-বিভূতি ভূষণ নন্দী-অম্লান দত্ত-রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের নিয়ে গঠিত গণমুক্তি পরিষদের সদস্যরা সে সময় এই সিঙ্গুর আন্দোলনকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছিলেন। হাতেগোনা এই কতিপয় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন দীপক ঘোষ। সে সময় তাঁকে দেখেছি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে তিনি কিভাবে কাজ করেছেন। তাঁর পুরোনো আইএএস তকমা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে তিনি মাঠে নেমে গিয়েছিলেন। সে সময় থেকেই দেখেছি তাকে অতি সাধারণ পোশাকে চলাফেরা করতে। তিনি খুব অল্পই গাড়ি ব্যবহার করতেন। বাসে- মিনি বাসে-অটো রিক্সায় তিনি নির্দ্বিধায় ঘোরাফেরা করতেন।

বিভিন্ন মহলের সঙ্গে অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল, প্রাক্তন বিচারপতি, প্রাক্তন আমলা, পুলিশ অফিসার এদের সঙ্গে বৌদ্ধিক যোগাযোগ ছিল দীপক কুমার ঘোষের। বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব। সিপিএমের বিরুদ্ধে গ্রামেগঞ্জে শহরে শহরতলীতে গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনের এবং প্রচার কার্যের logistics তৈরি করে দিতেন দীপক কুমার ঘোষ, এবং সেটা তিনি করেছেন একেবারে নিজের

অর্থে। সে সময় তাকে দেখেছি নিরলস ভাবে পরিশ্রম করতে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ঘনিষ্ঠ সহচর তখন আর কেউ ছিলেন না যার বুদ্ধি মেধা এবং বিচক্ষণতার ওপর নির্ভর করা যেত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এত ঘনিষ্ঠভাবে এবং কাছে থেকে দীপক ঘোষের মতন আর কেউ দেখেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগঠনের গোড়া থেকেই তিনি সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেছেন এবং সংগঠনের কাজে উত্থান পর্বে নিযুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষ এবং বিচক্ষণ একজন আইএএস আমলা, তাঁর মেধা ও শক্তি তৃণমূল দল গঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছিলেন। আরেকজন ব্যক্তি দীপক ঘোষের মতনই মমতাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন তিনি বর্তমান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট এই ভদ্রলোক আমাকে দীপক ঘোষ প্রসঙ্গে তার অনুভূতির কথা বলেছেন। অকুণ্ঠ চিত্তে তার প্রশংসা করেছেন।

আমলা হিসাবে দীপক ঘোষ তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসে বিধান রায় থেকে শুরু করে জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাজের ধারা ও ভাবের সঙ্গে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এইরকম একজন অভিজ্ঞ আমলা রাইটার্স বিল্ডিংস খুব কমই ছিলেন। বিধান রায়ের সময়ে তিনি ছিলেন সামান্য একজন কেরানী। পরে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়েছিলেন এবং তার পরে পরেই তিনি আইএএস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এটা তার ধৈর্য এবং কৃতিত্বের পরিচয়। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে নয়, পড়েছিলেন কমার্স বা বাণিজ্য বিভাগে। শুনেছি কমার্সে accountancy-তে তিনি যে নম্বর অর্জন করেছিলেন তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড নম্বর হয়েই আছে। অত্যন্ত শিক্ষিত এবং উচ্চ শ্রেণীর পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসার ফলে অপরাপর হিন্দুদের মতন নানা-ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত বাধাই তিনি অতিক্রম করেছিলেন জীবনের লক্ষ্য নিয়ে। জীবন তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সাধনা তাকে শক্তি দিয়েছিল।

সাড়ে ৩৭ বছর তিনি সরকারি চাকরি করেছেন। চাকরির সুবাদে এবং ব্যক্তিগতভাবে তার মতন দেশব্যাপী ভ্রমণ কোন আমলা করেছেন বলে আমার জানা নেই। ভারতের সব রাজ্যের সব জেলা তিনি ভ্রমণ করেছেন বলে দাবি করতেন। এই সুবাদে গোটা দেশের মানুষের হাল হকিকত তাঁর নখ দর্পণে ছিল।

সারা ভারতে গরিব জনসাধারণের জন্য তাঁর একটি সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু একটি পুস্তিকা ইংরেজিতে রচনা করেছিলেন। এই পুস্তিকাটির নাম 'Targeting Garibi Hatao.' এই পুস্তিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন পুলক নারায়ণ ধর, ডক্টর প্রদীপ হর এবং ডক্টর দিলীপ হালদার। সমস্ত সম্পাদনা করেছিলেন দীপক ঘোষ। এই বইটি প্রকাশের জন্য ৪২/ ৪৩ হাজার টাকা খরচ হয়েছে যার পুরোটাই তিনি নিজের তহবিল থেকে দিয়েছিলেন। এর একটি উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় কংগ্রেস সরকারের এবং বিরোধী দলগুলির সমস্ত সাংসদদের মধ্যে প্রচার করা। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে সংসদ অধিবেশন সেসময় দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাই সকল

সদস্যদের কাছে এই পুস্তিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। দিল্লি গিয়ে ডক্টর দিলীপ হালদার মশাই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এই পুস্তিকার একটি কপি প্রদান করেছিলেন।

রাজ্য সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর (১৯৯৫ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর তখন তাঁকে কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রথম ডাইরেক্টর-এর দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। তথ্যমন্ত্রী নিজে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি কারণ সরকারি অনুমোদন পেতে ২-৩ মাস দেরি হয়ে যায়। তিনি ততদিনে রাজনীতিতে যোগ দেবেন বলে মনস্থির করেন। সিপিএমের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তিনি সোমেন মিত্রের হাত ধরে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি চিত্র পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে ডাইরেক্টরের পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেন এবং মন্ত্রীর কাছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নাম সুপারিশ করেন।

দীপক কুমার ঘোষের রাজনীতিতে যোগদান একটি বিশিষ্ট ঘটনা। তিনিই প্রথম আইএএস পশ্চিমবঙ্গে যিনি কোন দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তিনিই প্রথম আইএএস সদস্য। কংগ্রেসের টিকিটে ১৯৯৯ সালে অক্টোবর মাসে উপনির্বাচনে তিনি দ্বিতীয় এমএলএ। প্রথম এমএলএ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে জয়ী হলেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় সদস্য ছিলেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর এইসব জেলায় ২০১০- ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে জড়িত ছিলেন। মাওবাদীদের সঙ্গেও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগসূত্র ছিলেন। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ ছিল দীপক ঘোষেরই মাধ্যমে। ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে লালগড়ে কিষাণজির সঙ্গে মমতার যোগাযোগের সূত্র ছিলেন তিনি, এটা দীপক বাবু দাবি করতেন। কিষেনজি প্রকাশ্যে বলেছিলেন ছোট বোন মমতাকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিশান জিকে আর চাননি। কিভাবে কিসেনজি মৃত্যুফাঁদে পা দিলেন তা দীপক ঘোষ প্রত্যক্ষভাবে জানেন। তিনি বলেছেন সুচিত্রা মাহাতো নামে যে মহিলা কিসেনজির "সহচরী" ছিলেন তাকে আড়াই কোটি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অসুস্থ কিষেনজিকে জঙ্গলের কোন জায়গায় ডেকে আনা হয়। তারপরের ঘটনা সকলেরই জানা।

দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা দীপক ঘোষের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে। এই ঘটনা দুটির তিনি সাক্ষী। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন বা মার্কসবাদী সশস্ত্র বিদ্রোহ। দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৭৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের সময়। নদিয়া জেলা, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সরকারের বড় ঘাঁটি ছিল। নদিয়া জেলা থেকেই ভারত সরকার বাংলাদেশের **মুক্তিযুদ্ধে সমস্ত সহযোগিতা ও নেতৃত্ব দিয়েছে।**

নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ কংগ্রেস শাসনকালে সিপিএমের কৃষকদের উস্কানির ফল। ১৯৬৭-তে কংগ্রেস শাসন অবসান হয়ে বামফ্রন্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর এর ফল বামফ্রন্ট সরকারের হাতে গরম আলুর মতন এসে পড়ে। এ সময় দীপক ঘোষ ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার মহকুমাশাসক বা এসডিও। প্রকৃতপক্ষে তার চাকরি জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই তিনি নকশালবাড়ি তথা চারু মজুমদার পন্থীদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে পরিচিত হন। এই ধারা অক্ষুন্ন ছিল জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত। এই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বহু তথ্যভিত্তিক 'নকশালবাড়ি আগুন ও ছাই' নামে একটি গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। দুটি খন্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের একটি মৌলিক দলিল হিসাবে ইতিহাসে স্থান পাবে।

পরবর্তী ঘটনাটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সময়ের ঘটনা। সেসময় তিনি নদিয়া জেলার ডিএম বা জেলাশাসক ছিলেন। তাঁর সময়েই সীমান্তবর্তী এই জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তথাকথিত মুজিবনগর। তাঁর বাংলোয় আশ্রয়প্রাপ্ত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অনেক সর্বাধিনায়ক। বাস্তবে তিনি এই জেলাশাসকের পদটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা শাসকের পদে রূপান্তরিত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার বাংলো লক্ষ্য করে পাক সেনারা একবার গোলাবার্ষণও করেছিল। কিন্তু তিনি অবিচল থেকে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের ঘটনার সুবাদে নদিয়া জেলার জেলাশাসকের পদটি সেই সময় আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। তাঁরই উদ্যোগে নদিয়া জেলাতেই প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি তখনও ভারত সরকার দেয়নি। দু-দেশের মধ্যে একটি ফুটবল খেলাকে উপলক্ষ করে তিনি সেদিন স্বাধীন ভাবে এই সাহসের কাজটি করেছিলেন।

তৃণমূল দলের প্রতিষ্ঠা পর্বে ও উন্নতি সাধনে দীপক ঘোষের বড় ভূমিকা থাকলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রীর কাছ থেকে উপযুক্ত মর্যাদা ও আসন পাননি। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী আসনে তাঁর নাম ঠিক হলেও শেষ পর্যন্ত একজন চটকদার বাক সর্বস্ব গায়ক জায়গা পেলেন। সেও আবার একজন একদা বামপন্থী লেখিকার আবদারে। ২০১১ সালেও প্রাক্তন আমলা মনীশ গুপ্তকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দাঁড় করালেন। যুব কংগ্রেসের ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের গুলিতে ১৯৯৩ সালে। এবং এই ঘটনার ঘটক ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব স্বয়ং মনীশ গুপ্ত।

দীপক কুমার ঘোষের লেখা ৩টি বই।

মনীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে আবার মনে এলো আরেকটি বিষয়। বুদ্ধদেব বাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন দীপক বাবুকে স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হল। নিয়োগ বিধি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সকলেই জেনে গেছেন দীপকবাবু স্বরাষ্ট্র সচিব হবেন। কিন্তু শেষ বেলায় বিকেল পাঁচটার পরে হঠাৎ সেই সিদ্ধান্ত পাল্টে গেল। জ্যোতিবাবু মনীশ গুপ্তকে স্বরাষ্ট্র সচিব নিয়োগ করে দিলেন। এটা দীপক বাবুর ক্ষেত্রে খুবই হতাশাব্যঞ্জক ছিল। অপমানজনক তো বটেই। দীপকবাবু আমাকে বলেছিলেন যে জ্যোতিবাবুর এক বিশিষ্ট মহিলা বান্ধবীর অনুরোধে তিনি মনীশ গুপ্তকে এই পদে বহাল করেছিলেন। সেই মনীশ গুপ্তই আবার তৃণমূলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃপায় দীপকবাবুকে সরিয়ে যাদবপুরে প্রার্থী হলেন। এর পেছনে ছিল টাকার রহস্য। তৃণমূলের সঙ্গে দীপকবাবুর এটাই ছিল বিয়োগান্ত নাটকের শুরু।

প্রখর স্মৃতিধর এবং আইনজ্ঞ দীপক ঘোষ শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন এই অটুট স্মৃতির অধিকারী। আত্মজীবনী লিখবার জন্য বহু অনুরোধ তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছিলেন আগে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে সে সম্বন্ধেই বলা দরকার। এবং এই মিথ্যাচারী ব্যক্তিটির আগে মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার।

অকাট্য তথ্য দিয়ে তিনি একের পর এক বই লিখে গেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। এইসব কারণে তার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানহানির মামলা করেছিলেন। দিনের পর দিন সেই মামলা ফিকে হয়ে গেছে। আর তার ফয়সালা করবার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উদ্যোগ ছিল না। দিনের পর দিন কোর্টে এই মামলার নড়াচড়া না দেখে তিনি বারবার বিচারককে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন কেন এই মামলা এগোচ্ছে না? যদিও তিনি অভিযুক্ত তবুও তিনিই মামলার শুনানির জন্য তাগাদা দিয়ে গেছেন।

দীপক বাবুর বইগুলো নিষিদ্ধ হয়নি। এইরকম কয়েকটি বই "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি"(২০১২), "এ কেমন মমতা", "সাদা মমতা কালো মমতা" এবং "মিথ্যাশ্রী"। জ্যোতি বসু (তাঁর স্ত্রীর গনা মামা) সম্পর্কেও একটি বই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, সেটি অর্ধ সমাপ্ত থেকে গেছে.....। কিন্তু দীপকবাবুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের অবদান "নকশালবাড়ি আগুন ও ছাই"(দুই খন্ড)। এই গ্রন্থটি সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বামধারা রাজনীতি বুঝতে গেলে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য।

জাতীয়তাবাদী এই মানুষটি সিপিএমের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। তাই শেষের দিকে তিনি বিজেপি দলে যোগ দিয়েছিলেন। এবং কিছু আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি শাখা তৈরি করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার এই চিন্তা ভাবনা ও ক্ষমতা সেভাবে দল কাজে লাগাতে পারেনি। এটা তার একটা বড় দুঃখ। তিনি পদ চাননি, চেয়েছিলেন কাজের পরিবেশ এবং কাজের দায়িত্ব। এ বিষয়ে তিনি অবশ্য দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি জানতেন। যে এই দলই পারবে পশ্চিমবঙ্গকে এই দুর্দৈব থেকে উদ্ধার করতে এবং আলোয় উত্তীর্ণ করতে। তিনি কোন পদ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন শুধু গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে। এই যুদ্ধে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অনেক কথা হল সেদিন। সে সময় তিনি এই আশাই ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর প্রতি আমার এই সশ্রদ্ধ নিবেদন।

বক্তব্য লেখকের নিজস্ব

নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি জেলা সভাপতি

শ্রীমতী স্মৃতিকণা বসু

শ্রীমতী অপর্ণা নন্দী

শ্রী মনোরঞ্জন জোদ্দার

শ্রী তুফান মাহাতো

শ্রী নবেন্দু সুন্দর নস্কর

শ্রী নিমাই কবিরাজ

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াতে নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল নাকাতানি।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াতে নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে সৌদি আরবের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আদেল আল-জুবেইর।

পহেলগাঁওয়ে পাক সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের শেষ শ্রদ্ধা অর্পন।

নয়াদিল্লিতে বিজেপি সদর দপ্তরে দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপির জাতীয় সভাপতি শ্রী জে.পি. নাড্ডা।

যখন দেশে
মজবুত সরকার
যখন দেশে
মোদী সরকার

UPA	NDA
মার্চ 1993 মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণ	সেপ্টেম্বর 2016 উরি হামলা
⊘	সেপ্টেম্বর 2016 সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
অক্টোবর 2005 দিল্লি সিরিজ বিস্ফোরণ	ফেব্রুয়ারী 2019 পুলওয়ামা হামলা
⊘	ফেব্রুয়ারি 2019 বিমান হামলা
নভেম্বর 2008 মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলা	এপ্রিল 2025 পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা
⊘	মে 2025 অপারেশন সিন্দুর

/BJP4Bengal bjpbengal.org

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।